বাংলা বানান, ব্যাকরণ ও বানান সংস্কার: একটি পর্যালোচনা

> “পাখীরা একদিন যেমন মাথার ঝুঁটি, ঝোলানো লেজ খুলে ফেলে ‘পাখি’ হয়ে গেল, শাড়ী যেমন কাঁধ থেকে দীর্ঘ আঁচল, মাথা থেকে আধা-ঘোমটাটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ‘শাড়ি’ হয়ে গেল, রানীরও তেমনি অদলবদল হলো। মূর্ধন্য-‘ণ’ ছেঁটে ফেলে উন্নাসিক আভিজাত্যের উচ্চতাটি বেশ খানিকটা কমে গেল। তার হ্রস্ব-ই এসে ছিনিয়ে নিল রাণীর ওড়না। মুকুটও। রানি এখন আর ‘রাজ্ঞী’র অপভ্রংশ নেই। রানি আনি-বানি-জানিনার বন্ধু হয়ে গেছে।” (নবনীতা দেবসেন, ‘বানান নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে’। মহাপাত্র ২০০৫:৯৭)

বাংলা বানানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলছে গত দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে। ১৭৭৮ সালে নাথানিয়েল হ্যালহেড ইংরেজি ভাষায় লেখা তাঁর বাংলা ব্যাকরণে, ১৮৩৩ সালে রাজা রামমোহন রায় তাঁর ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ গ্রন্থে, ১৮৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (শব্দতত্ত্বে সঙ্কলিত), ১৯১৭ সালে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ‘বাংলা ভাষার অভিধান’ এর ভূমিকায়, ১৯২৬ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Origin and Development of Bengali language গ্রন্থে এবং ১৯৩২ সালে হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ এর ভূমিকায় বানানের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ছাড়াও বহু লেখক-চিন্তাবিদ বানান ও লিপি সংস্কার নিয়ে তাঁদের মতামত দিয়েছেন সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধে বা পুস্তকাকারে (বাংলা বানান সংস্কারের ইতিহাসের জন্যে দেখুন ভট্টাচার্য ২০১০)। এই সব আলোচনার ফলশ্রুতিতে এবং প্রধানত রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় উদ্যোগে একটি বানান কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটি ১৯৩৬ সালের ৮ই মে তারিখে ‘বাংলা বানানের নিয়ম’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। প্রকাশের অব্যবহিত পরেই এই নিয়ম আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে এবং ১৯৩৭ সালের জুন মাসে পুস্তিকাটির সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই তৃতীয় সংস্করণকে ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে বাংলা বানানের আরও কিছু ‘নিয়ম’ এর প্রস্তাব করা হয়েছে: বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (হক ২০০৮), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি, বাংলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ড বানানবিধি, আনন্দবাজার পত্রিকা বানানবিধি, প্রথম আলো বানানবিধি ইত্যাদি ।

বর্তমান আলোচনার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য: শব্দের বানানের সাথে ভাষার ব্যাকরণের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা স্থির করা। আমার জানামতে, বাংলা বানান সম্পর্কিত কোন প্রবন্ধেই এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়নি। বর্তমান আলোচনার দ্বিতীয় এবং গৌণ উদ্দেশ্য, বাংলা বানান সংস্কারের প্রপঞ্চটি (Phenomenon) বিশ্লেষণ করে এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বর্তমান রচনাটিতে দুটি অংশ থাকবে: প্রথম অংশে প্রধানত বাংলা ভাষার উপাত্তের ভিত্তিতে ব্যাকরণের একাধিক

মডেলের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো ব্যাকরণের আলোচনায় শব্দের ‘বানান’ এর স্থান কোথায়। দ্বিতীয় অংশে দেখানো হবে, কত রকম বানান এখন চালু আছে, বানান সংস্কারকেরা কয়টি দলে, উপদলে বিভক্ত, ‘ভট্টাচার্য্য’ বানানে য-ফলা কেটে বাদ দেয়া উচিত হয়েছিল কিনা ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়।

১. বানান ও ব্যাকরণ

> ‘সর্বজনীন’ দুর্গাপূজা নাকি ‘সার্বজনীন’ দুর্গাপূজা? প্রশ্ন করাতে পুজোকমিটির দাদা গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন: ‘‘সার্বজনীনই’ শুদ্ধ বানান, কারণ হিন্দুধর্মে নিরাকারের পূজো হয় না! আর এক বার চাঁদার খাতায় ‘শরশ্বতী’ বানান দেখে চোখ কপালে তুলতেই পুজোকমিটির সেই একই দাদা বললেন: ‘তিন-চার রকমের বানান হয়। এবার এটাই পছন্দ করলাম নতুনত্ব আনার জন্যে!’ (আড্ডায় শোনা গল্প)

১ক. বানান কি ব্যাকরণকে আদৌ অনুসরণ করে?

প্রথমেই বলে নেয়া দরকার ‘ব্যাকরণ’ বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি। ব্যাকরণ অবশ্যই একটি শাস্ত্র। কিন্তু ‘শাস্ত্র’ অর্থে ‘ব্যাকরণ’ শব্দটি ব্যবহার করা হবে না বর্তমান আলোচনায়। এছাড়া ‘ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারার’ জন্যে যে পুস্তক পাঠ করার নিদান দিয়েছেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ‘ব্যাকরণ’ বলতে সেরকম কোন পুস্তকও বোঝানো হবে না এখানে। বর্তমান প্রবন্ধে ‘ব্যাকরণ’ বলতে আমি বোঝাবো মানব-মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অঙ্গ (চমস্কির Language organ) বা মানব-মস্তিষ্কের বিশেষ একটি ক্ষমতাকে, যে ক্ষমতা ব্যবহার করে মানুষ শব্দ ও বাক্য গঠন করতে পারে এবং গঠিত শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করে উঠতে পারে।

সোস্যুর থেকে শুরু করে সাপির, ব্লুমফিল্ড, চমস্কিসহ পৃথিবীর বেশির ভাগ ভাষাবিজ্ঞানী এ বিষয়ে মোটামুটিভাবে দ্বিমত পোষণ করেন না যে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব – এই তিনে মিলে হচ্ছে ব্যাকরণ। ব্যাকরণের এই তিনটি উপবিভাগের মধ্যে যে দু’টির সাথে শব্দের বানানের আদৌ কোন সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে সে দু’টি উপবিভাগ হচ্ছে ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব। বানান যদি কোন ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বা রূপতাত্ত্বিক নিয়মকে টায়ে টায়ে মেনে চলে তবেই আমরা বলতে পারবো যে শব্দের বানান ব্যাকরণের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো একটি বিষয়।

প্রথমেই আসি ধ্বনিতত্ত্বের কথায়। প্রমিত বাংলায় অক্ষর (Syllable)-এর উপধায় (Coda) বা শেষে /হ/ ছাড়া অন্য সব মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ পায়। আমরা লিখি ‘বাঘ’, ‘সাধ’, কিন্তু উচ্চারণ করি ‘বাগ’, ‘সাদ’। আমরা উচ্চারণ করি ‘বাঘের’, ‘সাধের’, কারণ সেক্ষেত্রে /ঘ/ ও /ধ/ প্রণব (Phoneme) অক্ষরের উপধায়

নেই, আছে দ্বিতীয় অক্ষরের সূচনায় (Onset) বা প্রথমে। এটা হচ্ছে বাংলা বানানে বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম প্রতিফলিত না হবার প্রথম প্রমাণ।

এর পর 'বাগযুদ্ধ' আর 'বাকশক্তি' – এই দুটি শব্দ লক্ষ্য করুন। প্রথম শব্দে আমরা পাচ্ছি 'বাগ' আর দ্বিতীয় শব্দে 'বাক'। পাণিনীয় ব্যাকরণ অনুসারে 'বাকশক্তি' ও 'বাগযুদ্ধ' সমাসবদ্ধ শব্দ যাতে পূর্বপদ 'বাক' এবং উত্তরপদ যথাক্রমে 'শক্তি' ও 'যুদ্ধ'। 'বাগযুদ্ধ' শব্দে 'বাক' এর 'ক' প্রণবটি 'গ'-তে পরিণত হওয়ার কারণ বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব। প্রমিত বাংলার ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে কোন অঘোষ, রুদ্ধ/স্পর্শ প্রণব (Unvoiced, Occlusive/Stop) (উদাহরণঃ 'প', 'ত', 'ক') কোন ঘোষ, রুদ্ধ প্রণবের (Voiced, Occlusive/Stop) ('ব', 'দ', 'গ', 'য') অগ্রবর্তী হতে পারে না। যদি কোন প্রতিবেশে (Context) এ রকম ব্যাপার ঘটে তবে অঘোষ প্রণবটি ঘোষীভূত হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে এই প্রক্রিয়াটির নাম 'পরাগত সমীভবন' (Regressive assimilation) বা 'পরাগত ঘোষীভবন' (Regressive voicing)। 'বাগযুদ্ধ' শব্দে 'ক' ঘোষীভূত হয়েছে, কারণ 'যুদ্ধ' শব্দটি শুরু হয়েছে ঘোষ 'য' প্রণব দিয়ে। 'বাকশক্তি' শব্দে 'ক' ঘোষীভূত হয়নি, কারণ এখানে 'ক' এর পরে আছে তালব্য, অঘোষ, শীষ (Sibilant) প্রণব 'শ'।

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে 'বাকশক্তি' আর 'বাগযুদ্ধ' শব্দদু'টির বানান বাংলা ধ্বনিতত্ত্বকে অনুসরণ করছে। কিন্তু পরাগত সমীভবন হয়েছে এমন অনেক শব্দের বানান, যেমন, 'হাতঘড়ি', 'কাঠগড়া', 'কাকডাকা' ইত্যাদি উচ্চারণানুগ নয়। এই শব্দগুলোর উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হওয়া উচিত ছিল 'হাদঘড়ি', 'কাঢগড়া', 'কাগডাকা'। একই ব্যাপার ঘটছে বাক্যের ক্ষেত্রেও। নিচের (১-২) উদাহরণে অঘোষ প্রণব 'ত', 'প' আর 'ক' যথাক্রমে ঘোষ প্রণব 'দ', 'ধ' আর 'ব' এর অগ্রবর্তী হয়েছে বলে প্রণবগুলো 'দ' (হাদদিয়ে), 'ব' (সাবধরে) আর 'গ' (শাঁগবাজাও) হিসেবে উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্তু শব্দগুলোর বানানে এই উচ্চারণ প্রতিফলিত হচ্ছে না।

১. বেদেরা **হাত দিয়ে সাপ ধরে**।

২. বর এসেছে, **শাঁক বাজাও**।

এবার অন্য দুটি শব্দের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক: 'সন্ত্রস্ত' আর 'আসতো'। প্রথম শব্দে 'সন্ত্রাস' প্রাতিপাদিকের অন্তে যুক্ত হচ্ছে {তো} প্রত্যয় আর দ্বিতীয় শব্দে {আস} ধাতুর উত্তর যুক্ত হচ্ছে{তো} বিভক্তি। প্রমিত উচ্চারণে 'সন্ত্রাস' শব্দটি শেষ হয় তালব্য 'শ' প্রণব দিয়ে আর 'সন্ত্রস্ত' শব্দে দ্বিতীয় শীষপ্রণবটি হয় দন্ত্য প্রণব 'স'। এমন মনে হতে পারে যে বাংলায় বুঝি শীষপ্রণব 'শ' (/ʃ/) দন্ত্য প্রণব 'ত' (/t/) এর অগ্রবর্তী হলে

অবশ্যই দন্ত্য, শিষ প্রণব ‘স’ (/s/)-এ পরিণত হয়। কিন্তু কথাটা সত্য নয়, কারণ ‘আসতো’, ‘বসতো’ ইত্যাদি শব্দে /ʃ/ প্রণবের কোন পরিবর্তন হয় না যদিও এসব শব্দে ‘শ’ (/ʃ/) প্রণব দন্ত্য ‘ত’ (/t/) এর অগ্রবর্তী হয়েছে। সুতরাং /ʃ/ প্রণবের /s/-এ পরিণত হওয়াটা ব্যতিক্রমহীন কোন নিয়ম নয়। ব্যতিক্রম আছে বলে নিয়মটিকে নিকষিত ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম বলা যাবে না। প্রশ্ন হতে পারেঃ /ʃ/→/s/ নিয়মটি ব্যাকরণের কোন উপাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হবে? ব্যাকরণের কোন কোন মডেলে নিয়মটিকে রূপতত্ত্বের (Morphology) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যাকরণের অন্য কিছু মডেলে এ ধরণের নিয়মকে রূপধ্বনিতাত্ত্বিক (Morphonological) নিয়ম বলা হয়।

৩. {ʃɔntraʃ} + {to} → ʃɔntrosto

৪. {aʃ} + {to}→ {aʃto}

বাংলা বানানরীতি অনুসারে ‘সন্ত্রাস’ ও ‘আস’ লেখা হয় দন্ত ‘স’ দিয়ে অথচ উচ্চারণে দুটি ধ্বনিক্রমই শেষ হচ্ছে তালব্য ‘শ’ দিয়ে। ‘সন্ত্রস্ত’ শব্দে দন্ত্য ‘ত’ প্রণবের অগ্রবর্তী বলে দ্বিতীয় শীষধ্বনির উচ্চারণ দন্ত্য। কিন্তু ‘আসতো’ শব্দে শিষধ্বনির উচ্চারণ দন্তমূলীয় বা তালব্য হওয়া সত্ত্বেও শব্দটি দন্তমূলীয়/তালব্য ‘শ’ দিয়ে ‘আশতো’ লেখা হয় না। এ রকম বহু ক্ষেত্রে আমরা দেখাতে পারি যে বাংলা বানানরীতি সব ক্ষেত্রে বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব (বা মডেলভেদে) রূপধ্বনিতত্ত্বকে অনুসরণ করে না।

১খ. বানানে কেন ব্যাকরণের প্রতিফলন হয় না?

মানবভাষা কতকগুলো চিহ্নের সমষ্টি এবং চিহ্নের রয়েছে দু’টি দিকঃ ‘দ্যোতক’ (Signifier) ও ‘দ্যোতিত’ (Signified)। মৌখিক ভাষার ক্ষেত্রে দ্যোতক অংশটি গঠিত হয় এক বা একাধিক প্রণব বা ধ্বনিমূল (Phoneme) দিয়ে আর লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে দ্যোতক অংশটি গঠিত হয় এক বা একাধিক বর্ণ (Letter) দিয়ে। সুতরাং শব্দের উচ্চারণ একটি দ্যোতক, শব্দের বানান অন্য একটি দ্যোতক। কোন ভাষায় যতটি প্রণব আছে ঠিক ততটিই যে বর্ণ থাকবে এমন কোন কথা নেই। যেমন, প্রমিত বাংলায় দু’টি শিষ প্রণব আছেঃ দন্ত্য /s/ ও তালব্য /ʃ/, কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় তিনটি শীষ বর্ণ রয়েছে; দন্ত্য স, তালব্য শ এবং মূর্ধণ্য ষ। প্রণবের তুলনায় বর্ণ কম বা বেশি থাকা বানানের সাথে উচ্চারণের তফাৎ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

বিভিন্ন কারণে কোন ভাষার প্রণব-তালিকা বা প্রাণবিক বর্ণমালায় (Phonemic alphabet) পরিবর্তন আসতে পারে। কালের প্রবাহে কিছু কিছু প্রণব হারিয়ে যায়, নতুন

প্রণব যোগ হয় প্রাণবিক বর্ণমালায়। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কোন বর্ণমালায় হঠাৎ করে নতুন একটি সদস্য যোগ করা যায় না বা অতি বৈপ্লবিক কোন পরিবর্তন আনা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দুই রকম এ-কার ‘ে’ এবং ‘এ্যা/অ্যা’ ধ্বনির জন্যে ‘ে’), বিদ্যানিধি যোগেশ চন্দ্র রায় (ঘোষ ১৪০০: ৬০) (‘ও’ বাদ দিয়ে ো: ‘োহে ম্রিতু, তুমি মোরে কি দেখাো ভয়!’), রাজশেখর বসু (ঘোষ ১৪০০:৭৭) (‘অ্যা’-র জন্যে a: ‘aকাউন্ট’) ফেরদাউস খান (ও-কারের চিহ্ন হিসেবে ‘ʃ’), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ই/ঈ বাদ দিয়ে ‘অি/অী’), মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (‘মোর’ এর পরিবর্তে ‘মৌর’) সহ আরও অনেকে এ বৃথাচেষ্টা করে দেখেছিলেন (ভট্টাচার্য, ২০১০:২২৬-২৩৮)।

যে প্রাণবিক ক্রম দিয়ে উচ্চারিত দ্যোতকটি গঠিত হয়, ঠিক সেই প্রণব-নির্দেশক বর্ণক্রম দিয়ে লিখিত দ্যোতকটি গঠিত হবেই এমন কোন কথা নেই। উচ্চারণ ও বানানে কমবেশি তফাৎ থাকেই, যে কোন ভাষায়। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রণবগুলোর স্বলক্ষণ (Distinctive features) বদলায়, প্রণবক্রমের উচ্চারণ বদলায় এবং এর ফলশ্রুতিতে বদলে যায় শব্দের উচ্চারণ। শব্দের বানানও যে বদলায় না তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন বানান সংস্কার কমিটির বহুবিধ যৌক্তিক ও অযৌক্তিক সুপারিশ মানতে গিয়ে শব্দের বানান যেমন বদলায়, তেমনি কালের বিবর্তনেও অনেক বানান বদলায়। ‘সহর’, ‘শাবান’ শব্দগুলো আজকাল লেখা হয় ‘শহর’, ‘সাবান’। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ’ গ্রন্থে (প্রথম মুদ্রণকাল: ১৯৪৫) ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দের বানান আজ আর চালানো যাবে না। অনেক বাংলাভাষীই আজ ‘একটী’ লিখতে চাইবেন না যেমনটি শ্রী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন। উচ্চারণ একটি প্রাকৃতিক/জৈবিক প্রপঞ্চ, বানান একটি সামাজিক প্রপঞ্চ। সুতরাং উচ্চারণ যত তাড়াতাড়ি বদলায়, বানান তত তাড়াতাড়ি বদলানো যায় না।

১গ. কৃতঋণ শব্দ ও শব্দের ব্যুৎপত্তি

ভাষাসৃষ্টি অনেকটা দই পাতার মতো। নতুন দই পাততে যেমন পুরোনো দই লাগে তেমনি যে কোন ভাষার শুরুতে একটি শব্দকোষ আর ব্যাকরণের কিছু নিয়ম থাকে। এর পর এক বা একাধিক ‘উৎস ভাষা’ থেকে নতুন নতুন শব্দ ও ব্যাকরণের নিয়ম এসে ‘প্রান্তভাষা’-র শব্দকোষ ও ব্যাকরণের কলেবর বৃদ্ধি করে, ব্যাকরণের পরিবর্তন ঘটায় এবং এর ফলে পুরো ভাষাটিই ধীরে ধীরে বদলে যায়। কেন এক ভাষা থেকে শব্দ ঢুকে পড়ে অন্য ভাষায়? এর প্রধান কারণ এই যে মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে পরিমাণ ও যত বিচিত্র অর্থ/ব্যঞ্জনাযুক্ত শব্দ মানুষের প্রয়োজন হয় সে পরিমাণ ও তত বিচিত্র অর্থ/ব্যঞ্জনাযুক্ত শব্দ সংশ্লিষ্ট ভাষার শব্দকোষে থাকবেই এমন কোন কথা নেই। মানুষকে কথা বলতেই হয় এবং কথা বলার প্রয়োজন এমন তীব্র যে বক্তাকে on the spot কোনও না কোন শব্দ খুঁজে নিতেই হয়।

অন্য ভাষা থেকে আসা শব্দকে প্রথাগত ব্যাকরণে ‘কৃতঋণ শব্দ’ (Loan word) বা ‘বিদেশী শব্দ’ (Foreign word) বলা হয়ে থাকে। এই নামগুলো বিভ্রান্তিকর। প্রথমত, কোন বিদেশী শব্দ প্রান্ত ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম না মেনে প্রান্তভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে না এবং এ কারণে উৎস ভাষায় কোন শব্দের যে উচ্চারণ থাকে প্রান্ত ভাষায় সে উচ্চারণ বজায় থাকে না; দ্বিতীয়ত, শব্দঋণের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ বা শব্দ ফেরৎ দেবার কোন ব্যাপার নেই। যা ফেরৎ দিতে হবে না তাকে ‘ঋণ’ বলে লাভ কি? তৃতীয়ত, বহুদিন আগে ধার করা শব্দকে ‘কৃতঋণ শব্দ’ বলা হয় না। প্রথাগত বৈয়াকরণ ও ব্যাকরণবেত্তারা বাংলার ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দকে, জাপানি ভাষার ক্ষেত্রে চীনা শব্দকে কৃতঋণ শব্দ হিসেবে বিবেচনা করেন না (জাপানী ভাষায় চীনা ছাড়া অন্য কৃতঋণ শব্দগুলো ‘কাতাকানা’ নামক এক বিশেষ লিপিতে লেখা হয়, চীনা শব্দ লেখা হয় ‘কাঞ্জি’ বা চিত্রলিপি দিয়ে)। প্রথাগত ব্যাকরণে ‘সিন্দুক’-কে আরবি শব্দ বা ‘টেবিল’-কে ইংরেজি শব্দ হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু এই শব্দ দুটি বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম মানতে গিয়ে এমন বদলে গেছে যে কোন আরবি বা ইংরেজিভাষী বাঙালির উচ্চারণে শব্দগুলোকে সহজে চিনতে পারার কথা নয়। ভাষাতত্ত্বে কমবেশি প্রশিক্ষণবিহীন কোন বাংলাভাষীর পক্ষে জানা সম্ভব নয় কোনটি কোন বাংলা শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে। ভাষা ব্যবহারের জন্য এ তথ্য জানার কোন প্রয়োজন নেই। একজন সাধারণ বাংলাভাষীর কাছে উৎসনির্বিশেষে সব শব্দই বাংলা শব্দ। সুতরাং শব্দের উপর ‘কৃতঋণ’, ‘দেশি’, ‘সংস্কৃতমূল’, ‘তৎসম’ ইত্যাদি লেবেল লাগানো ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই নিরর্থক, ‘ব্যাকরণ’ বলতে যদি আমরা ‘মস্তিষ্কের ভাষা-অঙ্গে (Language organ) রক্ষিত শব্দ ও বাক্যগঠনের কিছু সঞ্জননী (Generative) নিয়ম’ বুঝি।

তৎসম শব্দ নির্ধারণের মানদণ্ড কি তা কোন বানান-বিধানেই বলা হয়নি। কোন শব্দগুলো ‘তৎসম’, যেসব শব্দের উচ্চারণ সংস্কৃত ‘উচ্চারণের সম’, নাকি যেসব শব্দের বানান সংস্কৃত ‘বানানের সম’? যে যুক্তিতে ‘কর্ণ’ তৎসম শব্দ, সেই একই যুক্তিতে ‘সূর্য্য’ও তৎসম শব্দ হওয়া উচিত। এমন কি হতে পারে যে ‘সূর্য্য’ শব্দের উচ্চারণ সংস্কৃতে ‘সুরিয়া’ আর বাংলায় ‘সুইরজো’ বলে ‘সূর্য্য’-কে তদ্ভব শব্দ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে? কিন্তু ‘কর্ণ’ শব্দের উচ্চারণওতো বাংলা ও সংস্কৃতে এক নয়। সংস্কৃতে শব্দটির উচ্চারণ ‘করণ্’, বাংলায় ‘কর্‌নো’। বাংলা ভাষায় কোন সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণই সংস্কৃতের মতো নয় বলে ‘বাংলায় কোন তৎসম শব্দ নেই’ এ রকম দাবি করা যেতেই পারে। রবীন্দ্রনাথ এ সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন।

> “বাংলা ভাষার উচ্চারণে তৎসম শব্দের মর্যাদা রক্ষা হয় বলে আমি জানিনে। কেবলমাত্র অক্ষর বিন্যাসেই তৎসমতার ভাণ করা হয় মাত্র, সেটা সহজ কাজ। বাংলা লেখায় অক্ষর বানানের **নির্জ্জীব** বাহন – কিন্তু রসনা নির্জ্জীব নয় – অক্ষর যাই লিখুক, রসনা আপন

> সংস্কার মতোই উচ্চারণ করে চলে। সেদিকে লক্ষ্য করে দেখলে বলতেই হবে যে, অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি সে সকল শব্দের প্রায় ষোল আনাই অপভ্রংশ। যদি প্রাচীন ব্যাকরণ-কর্তাদের সাহস ও অধিকার আমার থাকত, এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে পারতুম।" (দেবপ্রসাদ ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র। দ্রষ্টব্যঃ মজুমদার ১৯৯৭:১৩৩)

শব্দের যে স্বরূপের কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সেটি হচ্ছে শব্দের হালনাগাদ উচ্চারণ। কিন্তু পৃথিবীর কোন ভাষাতেই শব্দের হালনাগাদ উচ্চারণ বানানে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় না। এর কারণ, শব্দের বানানে শব্দটির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস (যাকে এক কথায় বলা যেতে পারে 'ব্যুৎপত্তি' বা etymology) ধরে রাখা একটি বিশ্বজনীন প্রবণতা। এ রকমটি হওয়া স্বাভাবিক, কারণ ভাষা যেহেতু 'পুরোনো দই ও নতুন দুধের মিশ্রণে' সৃষ্টি হয় সেহেতু শব্দের বানানে, ভাষার ব্যাকরণে ভাষার ইতিহাসকে একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথ এ সত্যটি মানতে চাননি। তিনি ভাবতেন, যথাসম্ভব 'কানের সঙ্গে কলমের যোগ' রক্ষা করে 'উচ্চারণকেই সামনে রেখে বানানকে গড়ে তোলা ভালো' (ঠাকুর ১৩৯১:২৮২)

> "পুরাতত্ত্বের বোঝা মিউজিয়ম বহণ করিতে পারে, হাটে বাজারে তাহাকে যথাসাধ্য বর্জন করিতে হয়। এই জন্যেই লিখিবার বেলায় আমরা 'নুন' লিখি, পণ্ডিতই জানেন উহার মূল শব্দে একটা মুর্ধন্য ণ ছিল।... আমরা বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের দাবি করে থাকি কৃত্রিম দলিলের জোরে। বাংলায় সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণবিকার ঘটেনি এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ।... উচ্চারণের বৈষম্য সত্ত্বেও শব্দের পুরাতত্ত্বঘটিত প্রমাণ রক্ষা করা বানানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য এমন কথা অনেকে বলেন। ...দেহাবরণে বর্তমান ইতিহাসকে উপেক্ষা করে প্রাচীন ইতিহাসকেই বহন করতে চেষ্টা করার দ্বারা অনুপযোগিতাকেই সর্বাঙ্গে প্রশ্রয় দেয়া হয়। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯১: ২৫৯-২৬৫)

দেবপ্রসাদ ঘোষ শুধু উচ্চারণ অনুযায়ী বানান নির্ধারণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মত হচ্ছে, বানানে যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তির প্রতিফলন হতে হবে।

> "আপনারা বলেন 'হোলো', আমরা পূর্ব্ববঙ্গে বলি 'হইল'। সে যাহাই হউক, টা [হ'লো' বানানে (লেখকের সংযোজন)] 'ইলেক্'- যে একটা নিরর্থক unmitigated nuisance – শুধু vexation of spirit – শব্দতত্ত্বের দিক্ হইতে মোটেও একথা বলা চলে না। ইংরাজীর 's' এর যে ইলেক্ তাহাও এই কারণের সঞ্জাত। ফরাসী circumflex চিহ্ন, যেমন bête ইহাও বহু পরিমাণে elision হইতে উদ্ভূত; ল্যাটিন bestia হইতে Old French এ beste; তারপর s লোপ হইয়া bête – এই একই মূল হইতে ইংরাজী beast। শুধু ইলেক বা elision এর বিষয়ে নহে, অনেক বিষয়েই শব্দের বর্তমান রূপে প্রাচীন রূপের

> vestige বর্তমান আছে।” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেবপ্রসাদ ঘোষের পত্র। মজুমদার ১৯৯৭:১৪১-৪২)

কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্যোগে বস্তু বা স্থানের নাম পরিবর্তন এবং শব্দের বানান পরিবর্তন ভাষার বিবর্তনে স্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। ইংরেজি/ফরাসি Village শব্দটা এসেছে ফরাসি Vil শব্দ থেকে যার অর্থ ‘দুষ্ট, বদমাস’। সিনেমার Vilain শব্দে এই অর্থ এখনও বহাল আছে। Village শব্দটির আদি অর্থ ছিল ‘দুষ্ট, বদমাসদের এলাকা’। অভিজাত ব্যক্তিরা থাকতেন প্রাসাদে, আর বদমাস ছোটলোকেরা বস্তি বা Village এ। এখন Village এ ভালো লোকেরাও থাকেন, কিন্তু তাই বলে Village শব্দটা ইংরেজি শব্দকোষ থেকে বাদ দেবার কথা কারও মাথায় আসেনি। এক্ষেত্রে দ্যোতক একই আছে, দ্যোতিত বদলে গেছে। বানানও একটি দ্যোতক। উচ্চারণ বদলালে বানানও বদলাতেই হবে এমন কোন কথা নেই। পুরোনো বানান লিখে হালনাগাদ উচ্চারণ করা যে অসম্ভব নয় বাংলা শব্দকোষের ‘পদ্মা’, ‘লক্ষ্মী’, ‘আহ্বান’ ইত্যাদি শব্দ, ইংরেজি শব্দকোষের cough, station ইত্যাদি শব্দ তার প্রমাণ।

১ঘ. সঙিন উঁচিয়ে থাকা মূর্ধন্য ‘ণ’

প্রমিত বাংলার প্রণব তালিকায় মূর্ধন্য ‘ণ’ ও মূর্ধন্য ‘ষ’ নেই, যদিও কারও কারও অতিসতর্ক উচ্চারণে মূর্ধন্য ‘ষ’ শোনা গেলেও যেতে পারে। বাংলা বর্ণমালায় এ দু’টি বর্ণ আছে। আফগানিস্তান থেকে শুরু করে কম্বোডিয়া পর্যন্ত যে সব ভাষায় ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তিত রূপ ব্যবহার করা হয় সে সবগুলো ভাষার বর্ণমালাতেই সম্ভবত দুই রকম ‘ন’ আছে, সে সব ভাষার প্রণব তালিকায় দুই রকম ‘ন’ থাকুক বা না থাকুক। সংস্কৃত প্রণব তালিকায় মূর্ধন্য ণ ও মূর্ধন্য ষ উভয় প্রণবই ছিল। কোন এক কালে, হতে পারে বৈদিক যুগে বা তারও আগে বা পরে কোন এক ইন্দো-আর্য্য মান উপভাষায় একটি ‘ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধ’ (Phonological constraint) ছিল এরকম যে দন্ত্য ‘ন’ ও দন্ত্য ‘স’ প্রণবদ্বয় কখনই ‘ট’, ‘ঠ’, ‘ড’, ‘ঢ’ ও ‘ষ’ এবং তরল প্রণব ঋ ও র অব্যবহিত পরে ব্যবহৃত হতে পারতো না। এ রকম প্রতিবেশে মূর্ধন্য ‘ণ’ (উদাহরণ: ‘কণ্ঠ’, ‘ঋণ’) ও মূর্ধন্য ‘ষ’ (উদাহরণঃ ‘কষ্ট’, ‘রাষ্ট্র’) থাকতো।

এছাড়া যদি কোন ধাতু বা প্রাতিপাদিক দন্ত্য ন বা দন্ত্য শিষ দিয়ে শেষ হতো (‘আয়ন’, ‘স্থান’, ‘বহন’) এবং পূর্বপদ বা উপসর্গ শুরু হতো মূর্ধন্য কোন প্রণব, ঋ বা র দিয়ে (‘উত্তর’, ‘প্রতি’, ‘অনু’, ‘পরি’) তবে ধাতু/প্রাতিপাদিকের দন্ত্য ন বা দন্ত্য শিষ প্রণবের পরাগত সমীভবন বা মূর্ধন্যীভবন ঘটতো, অর্থাৎ দন্ত্য ‘ন’ পরিণত হতো মূর্ধন্য ণ-তে বা দন্ত্য স পরিণত হতো মূর্ধন্য ষ-তে (‘উত্তরায়ণ’, ‘প্রতিষ্ঠান’, ‘অনুষ্ঠান’, ‘পরিবহণ’)।

চমস্কী ও হালের (১৯৬৮) সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের আলোকে ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম:

[+ ব্যঞ্জন, + নাসিক্য, + দন্ত্য]→ [+ নাসিক্য, পশ্চাৎ তালব্য] / [ব্যঞ্জন, {[+ পশ্চাৎ তালব্য] [+তরল]}]

এবং ষ-ত্ব বিধানের নিয়ম

[+ ব্যঞ্জন, + শীষ, + দন্ত্য]→ [+ ব্যঞ্জন, + শীষ, + পশ্চাৎ তালব্য] /[{+ পশ্চাৎ তালব্য] [+তরল]}]

ণ-ত্ব বিধানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে: ঋ, র, ষ এর পরে স্বরবর্ণ, অন্তস্থ্ য়, হ এবং ক ও প-বর্গের সব বর্ণের (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, প, ফ, ব, ভ, ম, য়) পরে দন্ত্য ন এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। উদাহরণ: 'রণ' (র এর পরে অ এবং তার পরে ণ), 'অর্পণ' (র এর পর প-অ), 'অপেক্ষমাণ' (ষ এর পর য়-ম-অ), 'স্পৃহণীয়' (ঋ এর পর হ-অ এর ব্যবধান), 'প্রমাণ' (র এর পর অ-ম-আ) ইত্যাদি। সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে এই নিয়মটিকে সূত্রায়িত করা প্রায় অসম্ভব, বিশেষ করে ওষ্ঠ্য প্রণব প, ফ, ব, ম ইত্যাদির পরে মূর্ধন্য ধ্বনি উচ্চারণ করা সহজ বা স্বাভাবিক নয়। তবে নিয়মটি যেহেতু বানানে প্রতিফলিত হয়েছে সেহেতু কোনও না কোন সময় এটি উচ্চারণেও প্রতিফলিত হতো।

এছাড়া অনেক শব্দে বহু যুগ ধরে 'ণ' ও 'ষ' ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই শব্দগুলো বর্তমান বানানেই সংস্কৃত ভাষায় আত্তীকৃত হয়েছিল, সম্ভবত দ্রাবিড় বা অন্য কোন ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা থেকে।

ণ-ত্ব কথা

আপণ বিপণি কোণে বণিক নিপুণ
লাবণ্য ভণিতা পণ গণিকার গুণ
মাণিক্য গণিত গুণি পণ্য অগণন
অণু শণ বাণ তূণ শোণিত লবণ
বাণিজ্য নিক্বণে পুণ্য স্থাণু বীণা পাণি
করুণ লাবণ্যে গৌণ পিণাকের ফণি

ষ-ত্ব কথা

প্রত্যুষে বিষাদ ভাষ্যে মহিষীর রোষ
নিষিদ্ধ অভিলাষ পোষ্য পুরুষের দোষ
রোষে স্বরোচিষ মেষ নিষেধে মহিষ
ষোড়শীর পুষ্প কোষে মূষিকের বিষ

চাষার ভূষণে বাষ্প বিশেষণ ভাষা
আষাঢ়ে উষর উষা প্রদোষে জিগীষা

তৎসম শব্দে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান পরিত্যাগ করার মতো সিদ্ধান্ত কোন বানান কমিটিই এখনও পর্যন্ত সাহস করে নিতে পারেনি। তদ্ভব শব্দে ণ-ত্ব বিধান না মানার কথা বলা হচ্ছে সেই রবীন্দ্রনাথের আমল থেকে: 'বাণান', 'কাণ', 'সোণা' নয়, 'বানান', 'কান', 'সোনা'। আবার 'মরণ', 'বরণ' শব্দ তদ্ভব হলেও এখনও শব্দগুলোতে মূর্ধন্য 'ণ' সঙ্গিন উঁচিয়ে আছে। প্রশ্ন হতে পারে, 'আপণ', 'বাণিজ্য' ইত্যাদি শব্দে যদি ব্যুৎপত্তি বা পরম্পরার অজুহাতে মূর্ধন্য ণ রাখা যায়, তবে 'কাণ','সোনা', 'বাণান' শব্দে কেন একই অজুহাতে মূর্ধণ্য ণ রাখা যাবে না?

> "বর্ণমালায় কোনো একটি বর্ণকে (যেমন ধরুন 'ণ'-কে) আমরা যদি আদৌ রাখি, কর্ণ-চূর্ণ-পর্ণ ইত্যাদি শব্দে শিক্ষার্থীদের যদি ণ-কে চিনে নিতেই হয়, তা হলে ঐ শব্দগুলো ভেঙে অন্য যে-শব্দগুলি তৈরি হয়েছে সেগুলিতে চিহ্নটির সদ্ব্যবহার ঠিক কেন করা হবে না, সেই প্রশ্নের সদুত্তর কি কেউ দিতে পারেন? জ্যামিতি পড়তে ব'সে 'কোণ', 'ত্রিকোণ', 'চতুষ্কোণ', 'সমকোণ' ইত্যাদি শব্দ যদি ছেলেমেয়েদের শিখতেই হয়, তাহলে 'কোণ' থেকে 'কোণা' বানানটি মনে রাখাই কি তাদের পক্ষে সহজতর নয়?" (কেতকী কুশারী ডাইসন, 'বৈদগ্ধ্যের সপক্ষে'। মহাপাত্র ২০০৫: ৩৪১)

১৬. ব্যক্তি শব্দকোষ ও ছকমিলানো বানান

> "যখন সবাই পোলিটিক্যালি কারেক্ট হয়ে 'পাখি' লেখা ধরলো তখন আমিও ধরেছিলাম, কিন্তু এখন আবার ফিরে এসেছি শৈশবের 'পাখী'তে। বর্তমানে 'পাখী' আমার প্রতিবাদী বানান, প্রতিরোধের অস্ত্র।" (কেতকী কুশারী ডাইসন, 'বৈদগ্ধ্যের সপক্ষে'। মহাপাত্র ২০০৫: ৩৩৭)

আমরা উপরে বলেছি, প্রতিটি বানান এক একটি দ্যোতক। মানুষ শিশুকাল থেকে নির্দিষ্ট দ্যোতিতের জন্যে নির্দিষ্ট দ্যোতক ব্যবহারে অভ্যস্ত। নতুন বানান মানেই অভ্যাসের পরিবর্তন এবং নতুন বানান আয়ত্ব করা কমবেশি আয়াসসাধ্য। নতুন করে কোন কিছু শেখার ঝামেলায় মানুষ পারতপক্ষে যেতে চায় না। শব্দের ব্যুৎপত্তিরক্ষা অনেকাংশে অজুহাত মাত্র। আসল কথা হচ্ছে, শব্দের বিশেষ একটি বানানে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে মানুষ সহজে নতুন বানানকে মেনে নিতে চায় না।

> "শিক্ষার্থীরা বানান শেখে আর মনে রাখে একটা প্যারাডাইমের ভিতরে। সেই প্যারাডাইম থেকে চ্যুত হলে আমরা খুঁটিনাটি মনে রাখতে পারি না, জলে পড়ি। আমরা অনুক্ষণ নিশানা আর সম্পর্ক খুঁজি। একটার সাহায্যে আরেকটাকে চিনে নিই। পরস্পরসম্পৃক্ত শব্দদের চেহারাগুলোকে স্মৃতির ডিস্কে ধ'রে মনের বিভিন্ন খোপে ঢুকিয়ে

> দিই। রূপসাদৃশ্যে বুঝতে পারি কোন্ কোন্ শব্দ ব্যুৎপত্তিগত বিচারে সম্পর্কযুক্ত। যে একবার বুঝে গেছে যে 'হাতী' এসেছে 'হস্তী' থেকে, 'পাখী' এসেছে 'পক্ষী' থেকে, 'কুম্ভীর' 'কুমীর' থেকে, সে ইহজন্মে ভুলবে না। ঐ যুগলগুলোতে ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্য ছাড়াও ঈ-কারের উপস্থিতি তাকে নকশাটা মনে রাখতে সাহায্য করে। দুটো বানানই ছবির মতো তার মাথায় ব'সে যায়। বানানে সত্যিই চিত্রধর্ম আছে। দৃশ্যতা এখানে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। আমরা যখন পড়তে শিখি তখন আমাদের চোখ লেপাপোঁছা ভূচিত্র চায় না, খোঁজে বিশেষের সংকেত। একটা বানানবিধি আমাদের pattern recognition বা নকশা চিনতে পারার ক্ষমতাকে যত জাগিয়ে তুলবে, পুষ্ট করবে, তা তত সুস্থির (stable) হবে, তত সফল হবে। (কেতকী কুশারী ডাইসন, 'বৈদগ্ধ্যের সপক্ষে'। মহাপাত্র ২০০৫: ৩২৪-২৫)

প্রতিটি শব্দের বানান এক একটি ছক বা প্যাটার্ন। প্রতিটি প্যাটার্ন এক একটি ঐতিহ্য। ঐতিহ্য রক্ষার ব্যাপারটা মানুষের নিরাপত্তাবোধের সাথে জড়িত। মানুষ সাধারণত মনে করে, ঐতিহ্য হারিয়ে গেলেই বুঝি সব হারিয়ে গেল। অথচ, বহু পুরোনো ঐতিহ্য হারিয়ে যায়, নতুন ঐতিহ্য এসে তার জায়গা দখল করে। গাজনের গানের পুরোনো ঐতিহ্য প্রায় হারিয়ে গেছে। ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরীর নতুন ঐতিহ্য জেঁকে বসেছে। পরিবর্তন যদি কয়েক প্রজন্ম ধরে ধীরে ধীরে হয় তখন মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে সেই পরিবর্তন মেনে নেয়। 'সহর/শহর', 'শাবান/সাবান' বানান বহুদিন বিকল্প হিসেবে চালু ছিল, তারপর এক সময় 'শহর' আর 'সাবান' একমাত্র বানান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ধীরে ধীরে চালু হয়েছে বলে বানানের এই পরিবর্তন মানুষের অভ্যাসকে আহত করেনি। বানান কমিটি প্রস্তাবিত 'চিন' ও 'গ্রিক' বানান ব্যবহারকারীর অভ্যাসকে/ঐতিহ্যকে আচমকা আঘাত করে। তার উপর বিভিন্ন সংস্কার কমিটি কোন বিকল্প না রেখে বহুদিন ধরে প্রচলিত 'গ্রীক' ও 'চীন' বানানকে পুরোপুরি বাতিল করেছে। এ ধরণের সিদ্ধান্ত ব্যবহারকারীকে বিদ্রোহী ও হতাশাগ্রস্ত করে তুলতে পারে।

> "একদিকে লিখবো 'নীল', 'সুনীল', 'হীরক', অন্যদিকে 'নিলা', 'হিরা' – ওরকম করলে ছোটদের দৃশ্য নকশা চেনার ক্ষমতা তছনছ হয়ে যায়। কেউ কেউ আশা প্রকাশ করছেন যে এগুলো প্রচলিত হয়ে যাবে। তাঁরা হয়তো ভাবছেন যে গায়ের জোরে চালালেই এগুলো চলে যাবে। কিন্তু এটা কি এক রকমের সাংস্কৃতিক ফ্যাসিজ্‌ম্ হবে না? 'নিলা' হিরা' লেখাটা আমার বিচারে বর্বরতা। (কেতকী কুশারী ডাইসন, 'বৈদগ্ধ্যের সপক্ষে'। মহাপাত্র ২০০৫: ৩২৪-২৫)

ভাষাবিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে মোটামুটিভাবে একমত যে প্রতিটি ব্যক্তির মস্তিষ্কে একটি নিজস্ব শব্দকোষ (Individual Mental lexicon) আছে এবং তাতে বিভিন্ন শব্দের আক্ষরিক (Syllabic)/প্রাণবিক (Phonemic) অন্তর্লীন কাঠামো এবং/বা উচ্চারণ এন্ট্রি করা আছে। শব্দের ছক, অর্থাৎ শব্দ কিভাবে শেষ হচ্ছে এবং কিভাবে শুরু হচ্ছে তা

আমরা মনে রাখি এবং সেই অনুসারে নতুন শব্দ গঠন করি, ভুলে যাওয়া শব্দ খুঁজে বের করি বা কখনও না-শোনা শব্দ শুনলে শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। যেসব ভাষার লিপি আছে সেসব ভাষার ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের একটি লিখিত/বর্ণগত কাঠামো বা বিশেষ বানান শব্দকোষে লিপিবদ্ধ থাকাও অসম্ভব নয়। বানান বদলে গেলে সেই এন্ট্রিতে কিছুটা পরিবর্তন, কিছুটা ঢেলে সাজানোর ব্যাপার যে ঘটে সে সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই। কিন্তু পবিত্র সরকার এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন।

> ‘একদল ভাষাতাত্ত্বিক বিলিতি গুরু কাছে শেখা mental lexicon বলে এক জুজুবুড়ির ভয় দেখান। আমাদের মাথায় একটা mental lexicon (মানসিক অভিধান) আছে যাতে নাকি শব্দগুলোর বানানের ছবিটি দাগ কেটে বসানো আছে। বানান বদলালে নাকি আমাদের মানসিক বিপর্যয় ঘটবে। এ রকম ভ্রান্ত, ছদ্মবৈজ্ঞানিক এবং প্রশ্নহীন যুক্তি শুনে আমরা বিমূঢ় বোধ করি।” (‘বাংলা বানান তোমার কিসের দুঃখ’, দৈনিক প্রথম আলো, ১২ই অক্টোবর, ২০১২)

শ্রী সরকার যাঁদের ব্যঙ্গ করছেন তাঁরা, এবং যাঁদের তিনি রেয়াত করছেন অর্থাৎ আমরা বাকি সবাই উপরের মন্তব্যে যুগপৎ অবাক ও হতাশ হই। তাঁর বক্তব্যে এ ব্যাপারটা পরিষ্কার নয় যে কোন যুক্তিটা ছদ্মবৈজ্ঞানিক: ক) mental lexicon এর অস্তিত্ব, নাকি খ) মানসিক বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা। শ্রী সরকারের ‘আমেরিকান (বিলিতি নয় অবশ্য) গুরু’ জেরি স্যাডকও সম্ভবত mental lexicon-কে কখনও খারিজ করেননি। তাছাড়া আমার জানামতে কেউতো আজ পর্যন্ত লিখিতভাবে এ রকম কোন দাবি কখনও করেননি যে বানান বদলালে ভাষাব্যবহারকারীর মানসিক বিপর্যয় ঘটবে।

১চ. বহুলিপিতা বা বিকল্প বানান

শব্দকোষে যেমন সমনামিতা আর বহুনামিতার ব্যাপার রয়েছে, তেমনি ‘বহুলিপিতা’ এবং সমলিপিতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সমনামিতা, বহুনামিতা রদ করার উপায় নেই। সমলিপিতা কখনই বাঙালি দের খুব বেশি মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে বহুলিপিতার উপরেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ বিশেষভাবে খড়গহস্ত।

সমনামিতা (Synonymy) (সমার্থবোধক শব্দ/সমার্থনামিতা) (একাধিক শব্দের এক অর্থ): ‘নারী’, ‘রমণী’, ‘মহিলা’

বহুনামিতা (Polysemy) (ব্যুৎপত্তিগতভাবে সম্পর্কিত দুটি শব্দের এক উচ্চারণ, এক বানান, কিন্তু একাধিক অর্থ): (বইয়ের ‘পাতা’, গাছের ‘পাতা’)

বহুলিপিতা (Polygraphy) (একই শব্দের একাধিক বানান): ‘রাজি/রাজী’, ‘দেরি/দেরী’, ‘বাঙ্গালা, বাঙলা, বাংলা’

সমলিপিতা (Homography) (আলাদা দু’টি শব্দের এক বানান): খাবার ‘চাল’, ঘরের ‘চাল’, দাবার ‘চাল’

১.চ.১. কী কি আসলেই দরকার?

অনেক ক্ষেত্রে সমলিপিতা রদ করার উপায় বের করা যেতে পারে, যেমন প্রশ্নবোধক সর্বনাম ‘কি’ আর প্রশ্নবোধক অব্যয় ‘কি’ এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য প্রথমটিকে অনেকে দীর্ঘ ইকার দিয়ে লেখেন: তুমি কী চাও? কোন (Which) আর কোনো/কোনও (Some) এর মধ্যে তফাৎ করা যায় শেষেরটিতে ও বা ও-কার যোগ করে। যদিও প্রতিবেশ থেকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ‘কি’এর অর্থোদ্ধার করা সম্ভব তবুও রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে মনসুর মুসা পর্যন্ত অনেকেই সর্বনাম ‘কী’ এর পক্ষে সাফাই গেয়েছেন এই বলে যে এর ফলে অব্যয় ‘কি’ এবং সর্বনাম ‘কী’ এর মধ্যে পার্থক্য দেখানো যায়। ঢাকার বাংলা একাডেমীও ‘কী’ বানান রাখার পক্ষে। বাংলা একাডেমীর দুই মেয়াদে প্রাক্তন মহাপরিচালক মনসুর মুসা (২০০৭) একাডেমীর বানান বিধানের সাথে খুব একটা একমত নন, কিন্তু তিনিও ‘কি/কী’ চান।

> “আপনি বলিয়াছেন, অব্যয়াত্মক ‘কি’ শব্দ আপনি ‘কী’ লেখেন, আর সর্ব্বনাম ‘কি’ শব্দ ‘কী’ লেখেন; যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ‘তুমি কি বাড়ী যাবে?’ তুমি কী খাচ্ছ?” কিন্তু ‘তুমি বল কি হে’ এস্থলে আপনি কি ‘কী’ লেখেন? বোধ হয় না – অথচ এখানে ‘কি’ সর্বনাম। পক্ষান্তরে, ‘তুমি কী সুন্দর!’ (*How* handsome you are!) “কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!” এসব স্থলে ‘কি’ কি সর্ব্বনাম? প্রথমটিতে adverb দ্বিতীয়টিতে Interjection – অর্থাৎ অব্যয়াত্মক। “কী রাম, কী শ্যাম, কী যদু, সবই সমান।” – এ স্থলেও ‘কী’ কি সর্বনাম? এস্থলে উহা Conjunction – অর্থাৎ অব্যয়াত্মক। আমারত মনে হয় যে প্রশ্নাত্মক ‘কি’ ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ স্থলেই আপনি ‘কী’ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অথবা যেখানেই emphasis পড়ে ‘কি’র উপরে সেখানেই আপনি ‘কী’ লেখেন – সর্বনাম-অব্যয় খতাইয়া লেখেন না। আপনি অদ্বিতীয় সাহিত্যস্রষ্টা, কিয়ৎ পরিমাণে ভাষাস্রষ্টাও বটেন; কিন্তু বিশ্লেষণ বিষয়ে আমি আপনার যেন কিঞ্চিৎ অপাটব লক্ষ্য করিতেছি। বোধ করি সৃষ্টি এবং বিশ্লেষণে বিভিন্ন প্রকার প্রতিভার আবশ্যক হয়।” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেবপ্রসাদ ঘোষের পত্র। মজুমদার ১৯৯৭: ১৭৭)

প্রবাল দাশগুপ্ত (ব্যক্তিগত বৈদ্যুতিন যোগাযোগ) এ প্রসঙ্গে বলতে চান:

> ‘যে যে ক্ষেত্রে কি এর উপর শ্বাসাঘাত দিয়ে বাক্যটা উচ্চারণ করা আদৌ সম্ভব নয় সেগুলোর বানানহ্রস্ব ই, নইলে দীর্ঘ ঈ। এভাবে clitic কি থেকে non-clitic কী-কে আলাদা করা যাবে বলে আমার ধারনা। এই formulation রবীন্দ্রনাথ দেননি, কারণ তিনি ক্লিটিকের ব্যাপারটা জানতেন না। কিন্তু আপনি বিতর্কটাতে বৈদগ্ধ্য আনতে চাইলে আপনার দায়িত্ব আছে উল্টো পক্ষের হয়ে strongest possible formulation দাড় করিয়ে তার বিরুদ্ধে তীর চালানো।’

কি/কী সংক্রান্ত আলোচনায় বৈদগ্ধ্য যা আনার তা দেবপ্রসাদ ঘোষই এনেছেন। আমি যে তীরই ছুঁড়ি না কেন তাঁর তূণ থেকেই সেটা নিতে হবে। নিচের ক-গ উদাহরণে সর্বনাম ‘কি’ আর ঘ-চ উদাহরণে হ্যাঁ/না প্রশ্নে ব্যবহৃত অব্যয় ‘কি’ ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে অবস্থান পরিবর্তন করা হলেও সর্বনাম ‘কি’ উপর শ্বাসাঘাত পড়ে। অন্যদিকে অব্যয়-১ ‘কি’ এর উপর শ্বাসাঘাত পড়ে না এবং অব্যয়-১ ‘কি’ অগ্রবর্তি শব্দের অঙ্গীভূত হয়ে উচ্চারিত হয়।

সর্বনাম

১ক) আপনি খাবেন **কী**?
১খ) আপনি **কী** খাবেন?
১গ) **কী** খাবেন আপনি?

অব্যয়-১

২ঘ) আপনি কি খাবেন?
২ঙ) আপনি খাবেন কি?
২চ) খাবেন কি আপনি?

বাংলায় কমপক্ষে ৮ রকম ‘কি’ আছে। কি/কী বানান দিয়ে ১ ও ২নং কি এর মধ্যে তফাৎ নাহয় করা গেল কিন্তু বাকি ৬ রকম ‘কি’ এর বেলায় ‘কী’ নিদান দেবো আমরা? বাকি ৬ রকম ‘কি’ এর মধ্যে অন্তত ৩টিতে শ্বাসাঘাত পড়ে। এগুলো যদি দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে লিখি তবে ১নং উদাহরণের ‘কী’ থেকে এগুলোকে আলাদা করা যাবে কি করে? সুতরাং, দুই ‘কি’-তে ‘কী’ হবে, আরও কত ‘কি’ দরকার।

অব্যয় -২

৩) **কী**, আপনি মাটি থেকে খাবার তুলে খান, ছি!
৪) আপনি **এ**খানে কি খাবেন, আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, চলুন।
৫) আমি বলি **কি**, আজ বরং খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা থাক।
৬) কি করে খাবো, কাঁটাচামচ নেই যে!

বিশেষণ

৬) **কি** খাওয়াটাই না আপনি খান!
৭) কি খাওয়া, কি শোওয়া সব ব্যাপারে ও ঝামেলা করে!

দেবপ্রসাদ ঘোষের মত আমিও মনে করি, এক ‘কি’ দিয়েও চমৎকার কাজ চলে যায়। কারণ বিভিন্ন শ্রেণীর ‘কি’-তো আর আকাশ থেকে পড়ে না, কোনও না কোন বয়ানের (Discourse) অংশ হিসেবেই সেগুলো ব্যবহৃত হয়। বয়ানের প্রতিবেশ থেকেই বোঝা যায়, লেখক কোন ‘কি’-টি ব্যবহার করছেন, সর্বনাম ‘কি’, অব্যয় ‘কি’, নাকি অন্য কোন ‘কি’। নতুন একটি ‘কী’ সৃষ্টি করলে ঝামেলা কমে না, বরং বাড়ে। জ্ঞানী লোকেরা বলেন, যদি কোন একটি সিস্টেম কাজ করে, তবে ভুলেও তাতে কোন পরিবর্তন আনতে যেও না।

১.চ.২. লক্ষ আর লক্ষ্য

এতে কোন সন্দেহ নেই যে সংস্কারকদের উদ্দেশ্য সাধু, তাঁরা ক-এ দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে ‘কি’ এর সমলিপিতা যথাসাধ্য এড়াতে চান? তাই যদি হয়, তবে সমলিপি শব্দ ছিল না এমন দুটি শব্দ ‘লক্ষ’ (এক শত হাজার) এবং ‘লক্ষ্য’-কে কেন তাঁরা সমলিপি করে তুললেন ‘লক্ষ্য’ শব্দের য/য়-ফলাটি ছেঁটে দিয়ে? ‘লক্ষ্য’ শব্দে য-ফলা থাকবে, কিন্তু ‘লক্ষ করা’ ক্রিয়াপদের ‘লক্ষ’ অংশে য-ফলা দেয়া চলবে না। ‘লক্ষ্য করা’, ‘খেয়াল করা’... এগুলো মিশ্র ক্রিয়া। একটি মেরু ও একটি বাহক যোগে গড়ে উঠে এসব মিশ্র ক্রিয়া এবং এসব ক্রিয়ার মেরুটি বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি পদ হয়ে থাকে। কোন যুক্তিতে বিশেষ্য ‘লক্ষ্য’ ও মেরু হিসেবে ব্যবহৃত বিশেষ্য ‘লক্ষ্য’ আলাদা বানান হবে তা আমার বোধের অগম্য। উচ্চারণ-সাযুজ্যই যদি য-ফলা লোপের একমাত্র কারণ হয়, তবে ‘অমান্য করা’ বা ‘গণ্য করা’ ক্রিয়াকে যথাক্রমে ‘অমান্ন করা’ বা ‘গন্ন করা’ লেখা হচ্ছে না কেন?

প্রবাল দাশগুপ্ত (ব্যক্তিগত বৈদ্যুতিন যোগাযোগ) মনে করেন:

> ‘যারা সংস্কার করতে চাইছেন তারা তিনটে জায়গা ধরেছেন: লক্ষ (১০০০০০), লক্ষ (প্রনিধান) এবং লক্ষ্য (target)। অর্থাৎ Composite verb দু’রকম:
>
> ১) লক্ষ করুন, উনি চুপ করে থাকছেন কিনা।
>
> ২) পাখির মুণ্ড লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ুন।
>
> কেউ অন্য রকম লিখে থাকলে সে লেখায় Formulation এর শিথিলতা আছে। আমি অবশ্য সংস্কারের উদ্দেশ্য এই বুঝেছি। আমার মনে হয়নি এতে কোন অবিমৃশ্যকারিতা ঘটেছে। তবে আপনি তর্ক করতে চাইলে করতেই পারেন। কেউ

> যদি ‘লক্ষ্য’ বিলকুল তুলে দেবার কথা বলে থাকেন তাহলে আমি সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। দেখিনি সে রকম প্রস্তাব। উভয় বঙ্গে সব সময় ঠিক একই সংস্কার প্রস্তাব হয়নি। হতেই পারে আপনি যে version-টার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত সে রকম প্রস্তাব করা হয়েছে বাংলাদেশে।’

আমি এ প্রসঙ্গে অবশ্যই তর্ক করতে চাই, কিন্তু অকারণে নয়। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে ‘লক্ষ’ শব্দের উচ্চারণ ছিল ‘লক্‌খঅ’ আর ‘লক্ষ্য’ শব্দের উচ্চারণ ছিল ‘লইক্‌খঅ’। ‘লইক্‌খঅ’ যে ‘লক্ষ্য’ শব্দের মূল উচ্চারণ তার প্রমাণ শব্দটির বানান। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীরা য-ফলা উচ্চারণ করতে পারতেন না। তারা ‘কার্য্য’, ‘ধন্য’, ‘বাক্য’ ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ করতেন য-ফলা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব করে: যথাক্রমে ‘কারযো’, ‘ধন্নো’ এবং ‘বাক্‌কো’। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে পশ্চিমবঙ্গের বানানবৈদ্যরা তাঁদের য-ফলা উচ্চারণের ঐতিহাসিক অপরাগতাকে বৈধতা দিতে (হয়তো অবচেতনভাবে) নির্বিচারে য-ফলা কর্তন শুরু করেন ত্রিশের দশকে যার ফলশ্রুতিতে প্রথমে ‘কার্য্য’, ‘আর্য্য’, ‘ভট্টাচার্য্য’ ইত্যাদি শব্দের য-ফলা কাটা পড়ে এবং কয়েক দশক পরে ‘লক্ষ্য’ শব্দও এই অঙ্গচ্ছেদের শিকার হয়।

সংস্কারের আগে ‘লক্ষ’ ও ‘লক্ষ্য’ – এই দুই শব্দ ব্যুৎপত্তিগত, অর্থগত, উচ্চারণগত ও বানানগত দিক থেকে আলাদা ছিল। সংস্কারের পরে কি হলো দেখুন: ১) ‘লক্ষ’ (১,০০,০০০) এবং ‘লক্ষ’ (প্রনিধান) শব্দের ব্যুৎপত্তি আলাদা, কিন্তু বানান এক; ২) ‘লক্ষ’ (প্রনিধান) এবং ‘লক্ষ্য’ (target) এর ব্যুৎপত্তি এক কিন্তু বানান আলাদা। অর্থগত ও ব্যুৎপত্তিগত – এই উভয় দিক থেকে প্রনিধান ‘লক্ষ’ এর সাথে মিল আছে target এর ‘লক্ষ্য’ শব্দের। ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এই উভয় দিক থেকেই ‘লক্ষ’ (১০০০০০) এর সাথে ‘লক্ষ’ (প্রনিধান) এর কোন সম্পর্ক নেই। উচ্চারণের প্রশ্ন যদি উঠে তবে স্বীকার করতেই হবে যে শুধু পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের উচ্চারণেই এ দুটি শব্দের উচ্চারণ কমবেশি এক। তাহলে যুক্তির তুলাদণ্ড কোন দিকে হেলে, প্রনিধান ও target এই উভয় অর্থে ‘লক্ষ্য’ শব্দে য-ফলা রাখার দিকে, নাকি ‘প্রনিধান’ অর্থে ‘লক্ষ্য’ থেকে য-ফলা বাদ দেওয়ার দিকে? প্রনিধান ও target – এই উভয় অর্থে ‘লক্ষ্য’ বানান লিখলে কি অসুবিধা হয় তা আমার বোধের অগম্য। ‘পদ্মা’ লিখে যদি ‘পদ্দা’ উচ্চারণ করা যায়, ‘কন্যা’/‘বন্যা’ লিখে যদি ‘কোন্না’/‘বোন্না’ উচ্চারণ করা যায়, তবে ‘লক্ষ্য’ লিখে কেন ‘লক্ষ’ উচ্চারণ করা যাবে না?

ফার্দিনঁ দ্য সস্যুরের মতে ভাষিক উপাদানের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈপরীত্য। (Distinctiveness)। ‘লক্ষ্য’ শব্দটির য-ফলা কেটে শব্দটিকে ‘লক্ষ’ করার ফলে ‘লক্ষ’ শব্দটি যে একটি সমলিপি বা Homograph (প্রথম অর্থ: লক্ষ = উদ্দেশ্য; দ্বিতীয় অর্থ: একশ হাজার) হয়ে গেছে এবং এর ফলে যে লক্ষ ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে তা কি আমরা লক্ষ্য করেছি? বর্ণসঙ্কোচ করতে গিয়ে যদি কোন ভাষিক উপাদান তার বৈপরিত্য-

সূচক স্বলক্ষণটি হারিয়ে ফেলে তবে বর্ণসঙ্কোচের বৃথা চেষ্টা না করাই উচিত। কারণ বৈপরিত্যই ভাষার ভিত্তি এবং বৈপরিত্যের স্বার্থে বর্ণবাহুল্যও মেনে নেওয়া যেতে পারে।

বিকল্প বানান থাকলেও বিশেষ ব্যবহারকারী একটিমাত্র বানানই ব্যবহার করে। গবেষণা করলে দেখা যাবে, বিকল্প বানান চোখে পড়লে ব্যবহারকারীর দৃষ্টি কিছুটা হলেও ধাক্কা খায়। ‘নতুন’, ‘নূতন’– এই দু’টি বানানই চলে, কিন্তু অনেকেই ‘নতুন’ লেখেন না। ‘বৌ’, ‘বউ’ – এই দু’টি বানানও গ্রহণযোগ্য তবে প্রথম প্রথম যখন বউ ‘চালু’ হয় কোন পণ্ডিত নাকি এই বলে অনুযোগ করেছিলেন যে: ‘বৌ-ই যদি হবে তবে বৌয়ের ঘোমটা কোথায়?’ তবে কালের বিবর্তনে বহুলিপিতা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যায়। ‘বাংলা’, ‘বাঙলা’, ‘বাঙ্গালা’ – বহুদিন আগে চালু হওয়া এই তিনটি বানান এখনও গ্রহণযোগ্য হলেও ‘বাংলা’-ই শুধু চলে, বাকিগুলো বিরল-ব্যবহৃত। কোন জাতি তার লিখিত ভাষাচর্চা অব্যাহত রাখলে বহুলিপিতার অবসান হতে খুব বেশি সময় লাগে না।

১ছ. বিকল্পেরও সীমা থাকা উচিত

শব্দের বানানগুলো যেহেতু এক একটি দ্যোতক এবং যেহেতু এসব দ্যোতক একই ভাষাভাষী সমাজের অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন সব সদস্যরাই ব্যবহার করেন সেহেতু দ্যোতকগুলোর রূপ কি হবে সে ব্যাপারে কমবেশি ঐকমত্য থাকা প্রয়োজন। এক পত্রিকায় ‘ক্রিকেট’ বা ‘কৃষক’ লেখা হলো আর অন্য পত্রিকায় লেখা হলো ‘কৃকেট’ বা ‘ক্রিষক’ – এটা অভিপ্রেত নয় যদিও দু’টি বানানই উচ্চারণানুগ। কিছু কিছু অবিবেচক সংবাদপত্র ও পল্লবগ্রাহী লেখক ইচ্ছে করে বানাননৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চান যা একান্তই দুঃখজনক। তবে বানান যেহেতু একটি দ্যোতক সেহেতু কোন প্রচলিত বানানের একদম খোলনলচে পালটে দেয়া যায় না। একটা শব্দের বানানের কতটুকু পরিবর্তন সমাজ মেনে নেবে তার সম্ভবত একটা সীমা আছে। বানানের ব্যাপারে চরম নৈরাজ্যবাদীও ‘বোইষাখ’ (‘বৈশাখ’ এর পরিবর্তে), ‘ড়বইন্‌দ্‌রণাথ’ (‘রবীন্দ্রনাথ’ এর পরিবর্তে), ‘বউদ্‌ধো’ (‘বৌদ্ধ’ এর পরিবর্তে), ‘ক্রীশ্ন’ (‘কৃষ্ণ’ এর পরিবর্তে), ‘বঢ়াইত্তো’ (‘ব্রাত্য’ এর পরিবর্তে) ইত্যাদি বানান মেনে নেবার আগে দু’বার ভাববেন।

ইংরেজি ও হিন্দির অনুকরণে গত দুই দশক যাবৎ ১ বৈশাখ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ ইত্যাদি বানান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে লিখিত ও টকি মিডিয়ায়। এই সব উচ্চারণ ও বানানে বাংলা রূপতত্ত্বের তারিখশব্দ গঠনের নিয়মটিকে স্রেফ উপেক্ষা করা হয় ভাষাকে সরল করার খোঁড়া অজুহাতে, মূলত হিন্দির কু-প্রভাবে। অনেকে বলেন, লিখবো ‘১ বৈশাখ’, পড়বো ‘পহেলা বৈশাখ’। সাধু সাধু। বাংলা ভাষাকে সরল করাই যদি উদ্দেশ্য হবে তবে ‘করি’, ‘করেন’ ইত্যাদি বিভক্তিযুক্ত রূপ রাখার কি দরকার, জাপানি ভাষার মতো ‘আমি করা’, ‘আপনি করা’ বললেই হয়! ‘আমি’, ‘আপনি’ যেহেতু আছে, সেহেতু {ই} ও {এন} বিভক্তির অতিরিক্ত ঝামেলা রাখা কেন! মনে রাখতে হবে, বাংলা হিন্দিও

নয়, ইংরেজিও নয়। এর নিজস্ব ব্যাকরণ রয়েছে, শব্দগঠনের ও বাক্যগঠনের। ভাষা সরলও নয়, জটিলও নয়, ভাষা যেমন তেমনই। এত সব কিছু না জেনেই অশিক্ষিত নাপিতবৈদ্যরা গায়ের জোরে 'গরীবের বউ, সবার ভাবী' বাংলা ভাষার অঙ্গহানি করে থাকেন।

১জ. শুদ্ধাশুদ্ধের মাপকাঠি কি?

উৎস ভাষার রূপতাত্ত্বিক/ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম চাপিয়ে দেয়া হয় প্রান্তভাষার তথাকথিত কৃতঋণ শব্দের উপর। বহুদিন ধরে চলে আসা 'উপরোক্ত' বানানকে অশুদ্ধ ও তার বদলে 'উপর্যুক্ত' বানানকে শুদ্ধ বলার পেছনে কারণ একটাই: 'উপরোক্ত' সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম অনুসরণ করে না।

ভাষার নিয়মগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ ক) বৈয়াকরণিক নিয়ম (Grammatical rules) ও খ) আভিধানিক নিয়ম (Lexical rules)। বৈয়াকরণিক নিয়ম মোটামুটি সর্বব্যাপী, ব্যতিক্রমহীন। আভিধানিক নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম থাকে। সন্ধির নিয়ম একটি আভিধানিক নিয়ম, সুতরাং এর ব্যতিক্রম আছে। তাছাড়া সংস্কৃত সন্ধির সব নিয়ম বাংলায় প্রয়োগ করা যায় না। সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম অনুসারে /ɔ/+/a/ = /a/ (উদাহরণঃ ছাত্র+আবাস = ছাত্রাবাস)। কিন্তু একই নিয়ম অনুসারে 'ছাত্র+আন্দোলন' হওয়া উচিত 'ছাত্রান্দোলন', কিন্তু এ উচ্চারণ ও বানান গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলায় বলতে হবে 'ছাত্র-আন্দোলন' অর্থাৎ এ শব্দে সন্ধির নিয়ম প্রয়োগ করা যাবে না। খোদ সংস্কৃতেও সব শব্দে সন্ধির নিয়ম মানা হয় না, অনেক শব্দকে 'নিপাতনে সিদ্ধ' বা আর্ষ (<ঋষি) প্রয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলায়ও 'উপরোক্ত' বানানকে নিপাতনে সিদ্ধ করে নিয়ে আর্ষ প্রয়োগ বা 'গণপ্রয়োগ' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'উপরোক্ত' অশুদ্ধ – এ কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। শুধু পাণিনীয় ঘরানার সংস্কৃত ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ শব্দগুলোকে অশুদ্ধ মনে হতে পারে। অখণ্ড রূপতত্ত্ব (Ford, Singh and Martohardjono 1997) ঘরানার সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করলে এ শব্দগুলো পুরোপুরি শুদ্ধ। শব্দগঠনের এই তত্ত্বে শব্দের চেয়ে ক্ষুদ্রতর বস্তু অর্থাৎ উপসর্গ, ধাতু, প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না এবং শব্দকে রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে অবিভাজ্য, অখণ্ড বলে দাবি করা হয়। অখণ্ড রূপতত্ত্বে শব্দ গঠনের কাজে ব্যবহার করা হয় (৫-৬) এর মতো রূপকৌশল। অখণ্ড রূপতত্ত্ব অনুসরণ করে দাবি করা যেতে পারে যে ৫নং রূপকৌশলে 'উপরে' শব্দটি প্রক্ষেপ করে 'উপরোক্ত' শব্দটি গঠিত হয়েছে।

৫. $/\mathrm{Xe}/_{\text{অনুসর্গ}}$ ↔ $/\mathrm{Xokto}/_{\text{বিশেষণ}}$
উপরে ↔ উপরোক্ত; নিম্নে ↔ নিম্নোক্ত; শেষে ↔ শেষোক্ত

‘ইতিমধ্যে’ ও ‘মধ্য’ এই দুটি বাংলা শব্দের মধ্যে যে রূপগত পার্থক্য আছে সেটিকে একটি প্যাটার্ন বা ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে ‘ইতিপূর্বে’ শব্দটি গঠন করা যেতে পারে। ৫ ও ৬ এর মধ্যে পার্থক্য আছে। ৫ একটি রূপকৌশল, কারণ এর অস্তিত্ব একাধিক শব্দজোড় দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে। ৬ ততক্ষণ পর্যন্ত রূপকৌশল হবে না যতক্ষণ এর সমর্থনে দুইয়ের অধিক শব্দজোড় না পাওয়া যাবে। যদি কখনও ‘ইতিসঙ্গে’ জাতীয় কোন শব্দ বাংলা শব্দকোষে স্থান পায় তবেই ৬-কে রূপকৌশল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যাবে।

৬. $/\mathrm{Xo}/_{\text{বিশেষ্য}}$ ↔ $/\mathrm{itiXe}/_{\text{বিশেষণ}}$
মধ্য ↔ ইতিমধ্যে; পূর্ব ↔ ইতিপূর্বে

প্রকৃতপক্ষে বাংলা বানান সংস্কারের যাবতীয় প্রস্তাব করা হয়েছে ব্যাকরণের একটিমাত্র মডেল, পাণিনীয় মডেলকে অনুসরণ করে। পাণিনির ব্যাকরণ-মডেলে ‘ইন’ প্রত্যয় আছে বলে ‘ইন’-ভাগান্ত শব্দের বানানের ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মের প্রশ্ন উঠছে। যদি প্রত্যয়-উপসর্গ-বিভক্তি ইত্যাদি কাল্পনিক বস্তু ব্যবহার না করে শব্দগঠন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিতে সক্ষম এমন কোন মডেল আমরা ব্যবহার করি তবে এসব প্রশ্নের যাথার্থ্য আর থাকবে না।

পাণিনির ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য ছিল ক্রমবর্ধমান আর্য্য সাম্রাজ্যে যুক্ত হওয়া উপনিবেশগুলোতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেয়া। পাণিনির ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ীর নিয়মগুলো প্রধানত শিক্ষামূলক (Pedagogical)। এর মানে অবশ্য এই নয় যে ভাষার শিক্ষামূলক নিয়ম মাত্রেই বস্তুমূলক (Ontological) নয়। আসল কথা হচ্ছে এই যে শিক্ষামূলক নিয়ম ও বস্তুমূলক নিয়মকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা বানানের নিয়মগুলো শিক্ষামূলকও নয়, বস্তুমূলকও নয়, কারণ প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ ষোল আনায় আঠারো আনা পাণিনির ব্যাকরণের চর্বিত-চর্বণ। বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের নিয়মগুলোর বেশির ভাগ এখনও আবিষ্কৃতই হয়নি, শিক্ষা দেবারতো প্রশ্নই আসে না। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম দিয়ে বাংলা উপাত্তকে ব্যাখ্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। বাংলা ভাষার শব্দকোষ ও ব্যাকরণের তন্ময় (Objective) বর্ণনা দেয়া এসব নিয়মের উদ্দেশ্য নয়।

২. বাংলা বানান সংস্কার: একটি পর্যালোচনা

> “পিসেমশাই কোন কথা শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন ভাব করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর; তাই আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, উহার [অর্থাৎ শ্রীনাথ বহুরূপীর] ল্যাজ কাটিয়া দাও। তখন, তাহার সেই রঙিন-কাপড়ে-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।” (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব’। সেন ১৩৯৩: ২৭২)

২ক. লক্ষ্য ও প্রতিবন্ধের দ্বন্দ্ব

বানান সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য (Goal) হচ্ছে বানানে উচ্চারণের প্রতিফলন ঘটানো। ‘বর্ণন’, ‘কর্ণ’ ও ‘স্বর্ণ’ থেকে উৎপত্তি হওয়া শব্দ বাংলায় যথাক্রমে ‘বানান’, ‘কান’ এবং ‘সোনা’ বানানে লিখিত হবে, কারণ বাংলায় মূর্ধন্য প্রণব নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ‘বাণান’, ‘কাণ’ আর ‘সোণা’ ভুল বানান। বানান সংস্কারের প্রধান প্রতিবন্ধ (Constraint) হচ্ছে এই যে বানানে ব্যুৎপত্তির প্রতিফলন হতে হবে। ব্যুৎপত্তি মেনে লেখা হয়নি এমন বানান ভুল বানান। ‘ড়বীন্দ্রনাথ’ ভুল বানান কারণ সংস্কৃতে ‘রবি’ শব্দটি (মূর্ধন্য) ‘ড়’ দিয়ে লেখা হয় না, লেখা হয় দন্তমূলীয় ‘র’ দিয়ে। ‘পদ্দা’, ‘লকখি’ ভুল বানান, কারণ এই শব্দগুলো সংস্কৃতে লেখা হয় যথাক্রমে ‘পদ্মা’ ও ‘লক্ষ্মী’ হিসেবে।

ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানী, চীনসহ পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই এমন অনেক বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা উচ্চারণানুগ করার অজুহাতে বানান পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী। চীনা ভাষার হাজার হাজার চিত্রলিপির মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে সরল করার প্রস্তাব করেছিলেন সে দেশের সরকারী কোন কমিটি। এর প্রতিবাদে চীনা বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় মিছিল করেছিলেন গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিয়ে। ‘সরকার’ যে সিদ্ধান্ত দেয় তাকে চীন এর মতো বজ্রআঁটুনির দেশেও ‘পবিত্র’ বা অবশ্য পালনীয় মনে করা হয় না। ফরাসি একাডেমির প্রস্তাব করা অনেক বানান ফরাসিরা ব্যবহার করেন না। Hôtel (হোটেল), fête (উৎসব) ইত্যাদি ফরাসি শব্দে স্বরবর্ণের উপরে যে টুপির মতো চিহ্নটি (এর ফরাসি নাম Circonflex) আছে বহু দিন ধরেই সেটি বাদ দেওয়ার বিধান দিয়ে আসছে ফরাসি একাডেমি উচ্চারণের উপর এই চিহ্নের আলাদা কোন কোন প্রভাব নেই বলে। কিন্তু ফরাসিরা এ বিধান মানতে রাজি নন। তাদের কথা হচ্ছে : Ne touche pas mon orthographe (ন্য তুশ পা মোন অর্তোগ্রাফ) অর্থাৎ ‘আর যাই করো, আমার বানানে হাত দিও না!’

> “উচ্চারণানুযায়ী বাণানের mania একবার পাইয়া বসিলে কতদূর গড়াইতে পারে, তাহা আজকালকার ‘তরুণ’ ব্যাকরণবর্জ্জিত লেখকগণের ‘য্যামোন,’ ‘ত্যামোন,’ ‘এ্যামোন,’ ইত্যাদি রূপই দেখাইয়া দিতেছে; ইহার উপরে আবার বন্ধুবর সুনীতি চাটুয্যে মহাশয় বলেন যে, যদ্-শব্দজ যাবতীয় কথা ‘জ’ দিয়া লেখা উচিত, অর্থাৎ

> এবার আবার যেমন তেমন নহে একেবারে ‘জ্যামোন’। তাই ত আমাদের ন্যায় বঙ্গদেশীয়গণ অর্থাৎ বাঙ্গালগণ রাঢ় ও সূক্ষ্ম প্রদেশের সব কাণ্ডকারখানা দেখিয়া ‘ক্যাবোল্’ ভাবিতেছে – ‘কাণ্ডটা হইলে ক্যামোন?’” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেবপ্রসাদ ঘোষের পত্র। মজুমদার ১৯৯৭:১৪২)

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে উচ্চারণ-সাযুজ্য ও ব্যুৎপত্তির দ্বন্দ্বে ‘কান’ ও ‘সোনা’র ক্ষেত্রে উচ্চারণ জয়ী হয়েছে। কিন্তু ‘পদ্মা’ ও ‘লক্ষ্মী’-র ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে ব্যুৎপত্তি। তৎসম ‘কারণ’ ও ‘চরণ’ লিখতে হবে মূর্ধন্য ‘ণ’ দিয়ে। কিন্তু ‘বরণ’, ‘পূরণ’ ইত্যাদি ‘শব্দেও মূর্ধন্য ‘ণ’ ব্যবহৃত হবে, কারণ এসব শব্দে ব্যুৎপত্তি জয়ী হয়েছে যদিও ‘কান’ ও ‘সোনা’-র মতোই সেগুলো তদ্ভব শব্দ (‘বর্ণ’ থেকে ‘বরণ’ এবং ‘পূর্ণ’ থেকে ‘পূরণ’)। আবার ব্যুপত্তিগত ও উচ্চারণগত এই উভয়দিক থেকে গ্রহণ-অযোগ্য বানানও জনপ্রিয় হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে ‘শরৎচন্দ্র’ একটি ভুল বানান, কারণ সংস্কৃত সন্ধির নিয়মমতে (উৎ+চারণ = ‘উচ্চারণ’ এর মতো) শব্দটি হওয়া উচিত ‘শরচ্চন্দ্র’ (‘রবি-ইন্দ্র’ বা ‘উৎ-চারণ’ বানান যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে ‘শরৎ-চন্দ্র’ কেন গ্রহণযোগ্য হবে?)। প্রমিত বাংলার ফনোট্যাকটিক বা ধ্বনিকৌশল অনুসারে উচ্চারণের দিক থেকে ‘শরচ্চন্দ্র’ শব্দের উচ্চারণ সহজতর, কারণ ‘সাচ্চা’, ‘অর্চনা’ ইত্যাদি শব্দে অভ্যস্ত জিহ্বায় ‘চ’ প্রণবকে ইষৎ দীর্ঘায়িত করে ‘শরচ্চন্দ্র’ উচ্চারণ করা খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা নয়। খুব খেয়াল করে উচ্চারণ না করলে বেশির ভাগ বাংলাভাষী ‘শরৎচন্দ্র’ শব্দকে ‘শরচ্চন্দ্র’ উচ্চারণ করবে, কারণ দুই স্বরপ্রণবের অন্তবর্তী স্থানে ত-চ আছে এমন শব্দ প্রমিত বাংলায় বিরল।

অর্থশাস্ত্রে বলা হয়, চাহিদা ও যোগানরেখা যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে সে বিন্দুতে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় – চাহিদা কম হলে বা যোগান বেশি হলে পণ্যের দাম বাড়তে পারে না। একইভাবে বলা যায়, বানানের লক্ষ্য ও প্রতিবন্ধ-রেখা যেখানে ছেদ করে সেখানেই কালক্রমে বানান নির্ধারিত হয়। এটা হচ্ছে বানান পরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে জোর করে বানান বদলাতে গেলে (লিখিত) ভাষা-প্রপঞ্চে অনর্থক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে।

২খ. বাংলা বানানের দশবিধ সংস্কার

লক্ষ্য ও প্রতিবন্ধের দরকষাকষির ফলে কোন বানান সংস্কারই সংখ্যা ও প্রকৃতিতে অতিমাত্রায় বৈপ্লবিক হয়ে উঠতে পারে না। । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬-৩৭ সনের বানানরীতি থেকে শুরু করে ঢাকার বাংলা একাডেমীর বানানরীতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো যে অদ্যাবধি কমবেশি দশটি সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। এইসব সংস্কারের কোনটিকেই বৈপ্লবিক বলা যাবে না।

১. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন করতে হবে: ‘পর্ব্ব’, ‘তর্ক্ক’ নয়, ‘পর্ব’, ‘তর্ক’।

২. শব্দের শেষে বিসর্গ থাকবে না: ‘সাধারণতঃ’ নয়, ‘সাধারণত’।

৩. শব্দের শেষে হস্ চিহ্ন বা হসন্ত চিহ্ন থাকবে না। ‘বিষ্’ নয়, ‘বিষ’।

৪. দীর্ঘ ঈ/ঈ-কার এবং দীর্ঘ ঊ/ঊ-কার যথাসাধ্য বর্জন করতে হবে; ‘বাঙালী’, ‘বাড়ী’, ‘দায়ী’ নয়, ‘বাঙালি’,‘বাড়ি’, ‘দায়ি’।

১ থেকে ৪ হচ্ছে ‘সিংহাবলোকন বানান-সূত্র’। অর্থাৎ সিংহ যেমন বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পায় তেমনি এ চারটি বানানসূত্রও বহু শব্দে কার্যকর হবে, তৎসম, তদ্ভব নির্বিশেষে।

৫. শব্দের শেষে ং, ঙ দুইই চলবে, তবে স্বরাশ্রিত হলে ঙ বিধেয়: ‘রং’ বা ‘রঙ’, কিন্তু ‘বাঙ্গালি’ নয়, ‘বাঙালি’।

৬. অ-সংস্কৃত ও তদ্ভব শব্দে মূর্ধন্য ণ বর্জন করতে হবে: ‘কাণ’, ‘সোণা’, ‘কোরাণ’, ‘গভর্ণমেন্ট’ নয়, ‘কান’, ‘সোনা’, ‘কোরান’, ‘গভর্নমেন্ট’।

৭. বিবৃত এ-র জন্যে শব্দের আদিতে ‘অ্যা’ এবং মধ্যে ‘্যা’: ‘খ্যালো’, ‘অ্যারোমা’।

৮. অপ্রয়োজনে ক্রিয়াপদে ও-কার ব্যবহার করা যাবে না: ‘কোরে’ নয় ‘করে’, তবে ‘কাল’ নয়, ‘কালো’।

৯. ইলেক চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই: ‘ক’রে’ নয় ‘করে’।

১০. বিদেশি শব্দের st ধ্বনিক্রম ‘স্ট’ হিসেবে এবং z ধ্বনি ‘জ’ হিসেবে প্রতিবর্ণীকৃত করতে হবে: ‘ষ্টেশন’ নয় ‘স্টেশন’, ‘যোন’ নয় ‘জোন’, ‘মাযার’ নয় ‘মাজার’।

৫ থেকে ১০ হচ্ছে ‘কীটাবলোকন বানানসূত্র’। অর্থাৎ কীট যেমন শুধু নিকটে দেখতে পায় তেমনি এই ছয়টি সংস্কারও সব শব্দে নয়, শুধু তদ্ভব ও বিদেশি শব্দে কার্যকর হবে।

বানান সংস্কারের আগে বাংলা বানান ছিল তিন রকম:

১. শুদ্ধ বানান (উদাহরণ দেয়া বাহুল্য)

২. ভুল বানান (‘ড়বীন্দ্রনাথ’, ‘বাঙ্গলাদেষ’)

৩. বিকল্প বানান (‘শ্রেণী/শ্রেণি’, ‘তর্ক/তর্ক্ক’)

বানান সংস্কারের পরে গত আট দশকে আরও ৭ রকমের বানান সৃষ্টি হয়ে এখন কমবেশি ১০ রকমের বানান আছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে:

৪. বাতিল বানান (‘পূর্ব্বে’, ‘কর্ম্ম’)

৫. নতুন বিকল্প বানান (‘রাণী/রাণি’)

৬. বাতিল কিন্তু বাধ্য হয়ে মেনে নেয়া বানান (বাংলা একাডেমী)।

‘বাংলা একাডেমী’ বাধ্য হয়ে মেনে নেয়া বানান কারণ, ‘বাংলা একাডেমী’ প্রতিষ্ঠানটি ‘একাডেমী’ বানানেই নিবন্ধিত হয়েছিল। এখানে আইনী গ্রহণযোগ্যতার একটা ব্যাপার আছে। Calcutta শব্দটিকে ইদানিং Kolkata বানানে লেখা হচ্ছে, কিন্তু Calcutta University শব্দের বানানে কোন পরিবর্তন করা যায়নি, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়টি সেই বানানেই নিবন্ধিত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধন যদি Dacca বানানে হয়ে থাকে তবে University of Dhaka বানান ব্যবহার করে যত সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে সেগুলোর আইনী গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। ভুলে গেলে চলবে না যে Dhaka বানানটিকে বৈধতা দিয়েছিল এমন এক সরকার যেটিকে উচ্চ আদালত অবৈধ বলে রায় দিয়েছে। অবৈধ সরকারের জারি করা আইনের যদি গ্রহণযোগ্যতা না থাকে তবে অবৈধ সরকারের চালু করা বানানের কোন প্রকার বৈধতা থাকা উচিত কিনা ভাষাবিশারদ ও আইনবিশারদেরা তা ভেবে দেখতে পারেন।

৭. কোন নিয়ম ছাড়াই বাতিল করা বানান: ‘লক্ষ্য করা’ মিশ্রক্রিয়ার মেরু ‘লক্ষ্য’

৮. নিয়মের ভুল প্রয়োগে বাতিল করা শুদ্ধ বানান (‘ভট্টাচার্য্য’, ‘সূর্য্য’)

৯. শুদ্ধ কিন্তু অ-জনপ্রিয় বানান: ‘আম্‌মা’ (আম্মা), ‘রক্‌ত’, ‘কৃকেট’ (ক্রিকেট), ‘ক্রিষক’ (কৃষক) এবং

১০. অতিবৈপ্লবিক বানান:

“ অে’কদা অে’ক সৃগাল দ্রাক্ষা ক্ষেতে প্রবেশ করিল। ... শুপক্ষ ফলশকল দেখিয়া অৈ ফল খাইবার নিমিত্‌ত সৃগালের অতিশয় লোভ জন্মিল’। কিন্‌তু ফল শকল অুচ্‌চে

> ঝুলিতেছিল... লোভের বশীভূত হঅিয়া ফল পাড়িবার জন্যে সৃগাল জথেশ্‌ট চেশ্‌টা করিল', কিন্‌তু কোনও ক্রমে কৃতকার্জ হঅিতে পারিল' না।" (মুহম্মদ শহীদুল্লার বানান সংস্কারের উদাহরণ। ভট্টাচার্য ২০১০: ২৩৪)

২গ. সংস্কারের এলোপাথাড়ি ঝাঁটার বাড়ি এবং ভট্টাচার্য্যের ধুতির কোঁচা

> "এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহিরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চিৎকারে হুকুম দিতেছেন – আউর মারো – শালাকে মার ডালো ইত্যাদি। ... দরওয়ানেরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল! – আরে, এযে ভট্‌চায্যিমশাই।" (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব। সেন ১৩৯৩: ২৭১)

'ভট্টাচার্য্য', 'সূর্য্য' ইত্যাদি বানান বাতিল হওয়া উচিত নয় দুটি কারণে: প্রথমত, ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত বানানরীতির একটি নিয়ম: 'রেফ এর পরে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হইবে না'-র ভুল প্রয়োগের ফলে এই বানানগুলো বাতিল হয়েছে; দ্বিতীয়ত, ভট্টাচার্য্য', 'সূর্য্য' ইত্যাদি তৎসম শব্দ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানরীতি অনুসারে কোন তৎসম শব্দের বানান সংস্কারের আওতাভুক্ত ছিল না। 'সূর্য্য', 'আর্য্য' ইত্যাদি শব্দে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব নেই, কারণ 'য' ধ্বনির পরে যে ফলাটি যুক্ত হয়েছে ভুল করে 'য-ফলা' নামে ডাকা হলেও সেটি আসলে 'য়-ফলা'। বাংলায় 'য' (উচ্চারণ তালব্য 'জ') ও 'য়' দুটি পৃথক প্রণব ও পৃথক বর্ণ। সুতরাং এখানে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হওয়ার প্রশ্নই আসে না, কি উচ্চারণের দিক থেকে, কি বর্ণের দিক থেকে।

> "এখন থেকে ভট্টাচার্য্য শব্দের থেকে য-ফলা লোপ করতে **নির্ব্বিকার** চিত্তে নির্মম হতে পারব কারণ নব্য বানান বিধাতাদের মধ্যে দুজন বড়ো বড়ো ভট্টাচার্য্যবংশীয় তাঁদের উপাধিকে য-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন। এখন থেকে আর্য্য ও অনার্য্য উভয়েই অপক্ষপাতে য-ফলা মোচন করতে পারবে, যেমন আধুনিক মাঞ্চু এবং চীনা উভয়েরই বেণী গেছে কাটা" (দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র। মজুমদার ১৯৯৭:১৩৩)

রেফ এর পরে 'য্য' এর অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে যুক্তির লেশ মাত্র নেই: 'র্য্য' গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ পণ্ডিতেরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন! রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পণ্ডিতদের পুরোধা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৬ সালের বানান কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন, কিন্তু পরিণত বয়সে (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ) তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

> ''আমার মতে আমরা ভুল করিয়াই 'র্য্য' স্থলে 'র্য' গ্রহণ করিতেছি – সমগ্র বাংলার উচ্চারণ বিচার করিলে 'র্য্য' লেখাই ঠিক, কারণ বাঙ্গালা 'র্য' উচ্চারণে ঠিক রেফের নিচে 'য' (বা

> ‘য়’)-র দ্বিত্ব নহে, ইহা হইতেছে ‘র্জ্য’ – অর্থাৎ রেফ-যুক্ত ‘জ’-এ ফলা, এই য-ফলা কার্যতঃ দ্বিত্ব ‘য়’-নহে, ইহা বাঙ্গালায় কোনও-না-কোনও প্রকারে রক্ষিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ‘ধর্ম, তর্ক, পার্থ’ ইত্যাদি উচ্চারণ ‘ধর্‌ম,‘তর্‌ক, অর্‌থ, ‘পার্‌থ’, কিন্তু ‘কার্য্য, আর্য্য = কার্জ্য, আর্জ্য’, বহুশঃ উচ্চারণে ‘কাইর্‌জ, আইর্‌জ’; সেইরূপ ‘বাধ্য, মান্য = ব ইদ্ধ, ম ইন্ন, – য-ফলার এই বিশেষ উচ্চারণ পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রক্ষিত আছে। ” (‘বাংলা অক্ষরে ইংরেজি নাম ও শব্দ’। মজুমদার, ১৯৯৭:২১৭)

মণীন্দ্র কুমার ঘোষও ‘র্য বনাম র্য্য’ শীর্ষক রচনায় (ঘোষ ১৪০০: ১২০) রেফ এর পরে য-ফলা রাখার পক্ষে সওয়াল করেছেন। দেবপ্রসাদ ঘোষ রেফোত্তর য-ফলার সপক্ষে লিখেছেন:

> ‘আর্য্য’তে ্য-ফলা থাকিবে না, অথচ ‘দৈর্ঘ্য’তে থাকিবে, এবং ‘ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী’ তে ষ্ট চলিবে না, অথচ ইষ্ট মন্ত্রে চলিবে? … ‘র্য্য’ এর বেলাতে ত কথাই নাই; উহা হইতে ্য-ফলা লোপ করিলে উহার উচ্চারণ ‘র্জ’ তে পরিণত হইবে, ‘র্জ্য-তে নহে। … য-ফলাকে silent ধরা যায় না, কারণ কতকটা বর্ণদ্বিত্ব আনয়ন করিলেও, উহার একটি স্বতন্ত্র ধ্বনি স্পষ্টই বর্ত্তমান” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেবপ্রসাদ ঘোষের পত্র। মজুমদার ১৯৯৭:১৬১-১৬৩)

ভট্টাচার্য্য (১৯৯৮:৩২২) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> “‘য’ এর উচ্চারণ ‘জ’ জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা য-বর্ণ দিয়ে ‘সুর্য’ বানানটি লিখে শব্দটির বিবর্তনের ইতিহাস ধরে রাখছি। ্য-ফলাটিকে বজায় রাখলে ইতিহাসটি সম্পূর্ণ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ‘বাক্য’ শব্দটির ্য-ফলা যদি থাকতে পারে তবে সূর্য্যদেবের উত্তরীয় বা ভট্টাচার্য্যের ধূতির কোঁচা ্য-ফলাটি রাখলে এমন কি ক্ষতি হবে? বানান শুধু উচ্চারণানুগ হলে চলে না, কারণ শব্দের বানান শুধু উচ্চারণের প্রতিফলন নয়, বানানের সাথে জড়িয়ে থাকে শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস।”

কেতকী কুশারী ডাইসন বলেন:

> “ছেলেবেলায় পূর্ববঙ্গীয় আত্মীয়দের মুখে ‘আচাইর্জ’, ‘ভট্টাচাইর্জ’, ‘অইদ্দ’ (‘অদ্য’), ‘মইদ্দপান’ (‘মদ্যপান’) ইত্যাদি উচ্চারণ শুনেছি। হয়তো ওপারে প্রাদেশিক স্তরে সে-উচ্চারণ এখনও বহাল আছে। তা ছাড়া কথ্য ভাষার ‘ধম্মো’, ‘কম্মো’ এবংবিধ উচ্চারণ আজও আমাদের ইশারা দেয় যে রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব দ্বারা উচ্চারণের একটা বৈশিষ্ট্য সূচিত হতো।” (‘বৈদগ্ধ্যের সপক্ষে’, মহাপাত্র ২০০৫: ৩১৬-১৭)

প্রবাল দাশগুপ্ত (ব্যক্তিগত বৈদ্যুতিন যোগাযোগ) বলেছেন:

> ‘আর্য্য’, ‘সূর্য্য’ প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনায় ‘আপনার যুক্তি শেষমেশ দাঁড় করাতে পারবেন। কিন্তু আপনার একটা দায়িত্ব হলো data base থেকে ‘ন্যায্য’ আর ‘সাহায্য’ শব্দদুটোকে বাদ না দেয়া। ‘ন্যায্য’, ‘সাহায্য’ দেখে অনেক পাঠকেরই কিন্তু মনে হতে পারে double অন্তস্থ য যুক্তিটা একেবারে অসার নয়।’

ধন্যবাদ। সে পাঠকদের আমি ‘সহ্য’ আর ‘বাহ্য’ শব্দ দুটি দেখতে বলবো। এ দুটি শব্দে যথাক্রমে ‘সহ্’ ও ‘বহিঃ’ এর সাথে য (প্রত্যয়) যুক্ত হয়েছে। সুতরাং এ দুটি শব্দে যদিও য-এর দ্বৈত উচ্চারণ হচ্ছে য/য় এখানে একটি। অতএব য এর দ্বৈত উচ্চারণ হলেই যে সেখানে দুটি য থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া, ‘ন্যায্য’ আর ‘সাহায্য’ পাণিনীয় ব্যাকরণ অনুসারে সাধিত শব্দ: ন্যায়+য় (প্রত্যয়) এবং সহায়+য় (প্রত্যয়) এবং গুন/বৃদ্ধির নিয়মে প্রাতিপাদিকের স্বরধ্বনির পরিবর্তন (অ থেকে আ)। সংস্কৃতে ‘য’ ধ্বনি বা বর্ণ ছিল না, সুতরাং এ দুটি শব্দে ‘য’ আসবে কোথা থেকে?

বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানানের ১.০১ ধারায় বলা হয়েছে: “তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এই সব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।” রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন (মজুমদার ১৯৯৭:১৪৮): “যে প্রস্তাবটি ছিল বানানসমিতি স্থাপনের মূলে, সেটা প্রধানত তৎসম শব্দসম্পর্কীয় নয়।” প্রশ্ন হচ্ছে: ‘ভট্টাচার্য্য’, ‘উপাচার্য্য’, ‘সূর্য্য’, ‘দায়ী’, ‘চীন’ কি তৎসম শব্দ নয়? এসব শব্দ কি অবিকৃতভাবে সংস্কৃত থেকে বাংলায় গৃহীত হয়নি? এই সব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি কি হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্দিষ্ট নয়? তাই যদি হয়, তবে কেন ‘সূর্য’, ‘দায়ি’, ‘চিন’ শুদ্ধ বানান হবে? কেন ‘ভট্টাচার্য্য’, ‘উপাচার্য্য’, ‘আর্য্য’, ‘সূর্য্য’ ইত্যাদি বানানে য/য়-ফলা বাদ যাবে? মনে হচ্ছে, (সংস্কারের) নেশা যখন একবার পেয়ে বসে, তখন শুদ্ধ বানানও পণ্ডিতদের কাছে ‘অরক্ষণীয়া’ বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁদের এমন মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে যে নিজেদের চাপিয়ে দেয়া নিয়ম তাঁরা নিজেরাই ক্রমাগত অমান্য করতে থাকেন, সংস্কারের এলোপাধারি ঝাঁটার বাড়ি মেরে ‘স-ফলা’ ভট্টাচার্য্যকে ‘নিষ্ফলা’ করে দেন। মনু অকারণে বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণের সুরাপান নিষিদ্ধ করেননি!

২ঘ. বানানের প্রশ্নে বুদ্ধিজীবীদের অষ্টধা বিভক্তি

গত আট দশকে বানান সংস্কারের প্রশ্নে যেসব মতামত পাওয়া গেছে সেগুলোর প্রকৃতি অনুসারে বুদ্ধিজীবীদের ৮টি পৃথক শ্রেণী বা দলে ভাগ করা যেতে পারে:

প্রথম দল: এক শব্দ, এক বানান, কোন বিকল্প নয়। এঁদের যুক্তি হচ্ছে, ভাষা ব্যবহারকারী ও ভাষাশিক্ষার্থী বিশেষত শিশুদের মনে বিকল্প বানান অকারণ দ্বিধার সৃষ্টি করবে। বিকল্পই যদি থাকবে তবে আর সংস্কার করা কেন?

> “মধ্যবিত্ত লেখাপড়া-করা লোকেরা বানান নিয়ে খুনসুটি করুন, তাতে আমাদের তত দুর্ভাবনা নেই। শিশুরা এক শব্দের একটিমাত্র বানান শিখছে কি না সেটা অনেক বড় দুশ্চিন্তা।’ (পবিত্র সরকার, ‘বাংলা বানান তোমার কিসের দুঃখ?’ *প্রথম আলো*, ১২ই অক্টোবর, ২০১২)

প্রায় প্রত্যেক দেশে বানান সংস্কারবাদীদের পেছনে থাকে ক্ষমতা, কোনও না কোন কায়েমী স্বার্থবাদী মহল, এবং অবশ্যই কোনও না কোন সরকার, কারণ যে কোন সরকারেরই নতুন কিছু একটা করে দেখানোর দায় বা বাতিক থাকে। অবোধ শিশুদের শিখণ্ডী করে এঁরা সংস্কারের লড়াই শুরু করেন। ভাত ছিঁটালে যেমন কাকের অভাব হয় না তেমনি বানান সংস্কারে অত্যুৎসাহী সরকারী বুদ্ধিজীবীরও আকাল পড়ে না কোন দেশে। এদের দাবি: ‘বদলে যাও, বদলে দাও’। আগেই বলেছি, ইতিমধ্যে তাঁরা বদলে দিয়েছেন বাংলা ভাষায় তারিখ শব্দের ব্যাকরণ। ‘পঁচিশে বৈশাখ’, ‘বাইশে শ্রাবণ’ নয়, ‘২৫ বৈশাখ’, ‘২২ শ্রাবণ’! আকাশ সংস্কৃতির কুপ্রভাবে হিন্দি আর ইংরেজি রূপতত্ত্বের নির্লজ্জ অনুকরণ। লাই পেয়ে এঁরা এখন সংখ্যাশব্দকেও বদলে দিতে চান: ‘এগারো’, ‘বারো’ নয়, একেবারে ‘দশ এক’, ‘দশ দুই’! ভিন্ন মতাবলম্বীদের ক্ষীণ প্রতিবাদ সরকারের চোখে ‘মধ্যবিত্তের খুনসুটি’। কেতকী কুশারী ডাইসনের প্রশ্ন: ‘আধুনিক হতে চেয়ে, সেকেলে হওয়া এড়াতে গিয়ে আমরা missing the obvious-এর মতো কিছু করছি না তো?” আমার প্রশ্ন: ‘সব কিছু বদলাতে’ গিয়ে সব কিছু ‘বলদে’ (‘বলদ’ প্রাতিপাদিক থেকে ব্যুৎপত্ত ক্রিয়াপদ) দিচ্ছি বা নিজেরাই ‘বলদে’ যাচ্ছি নাতো? সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বৃদ্ধ পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে বাংলা বানানের সংস্কারের সিদ্ধান্তে ভিন্ন মতাবলম্বীদের হতাশার প্রতিফলন ঘটেছে:

> “অসহায়া বঙ্গভাষার অঙ্গে যে সে ইচ্ছামত শল্য প্রবেশ করাইবে, অঙ্গচ্ছেদ করিবে, সে অত্যাচার দেখিয়া রক্ষা করিতে অক্ষম ব্যক্তিগত আক্ষেপ ভিন্ন আর কি করিতে পারে?” (রবীন্দ্রনাথের নিকট দেবপ্রসাদ ঘোষের পত্র। মজুমদার ১৯৯৭: ১৯১)

দ্বিতীয় দল: বানানে ব্যুৎপত্তি আর প্যাটার্ন রেকগনিশনের প্রতিফলন হতেই হবে।

> “বানানের হাত ধরে ব্যুৎপত্তি এবং ব্যাকরণ উভয়ের দরজাই খোলা যায়। আমিতো এখনও লিখি ‘মাসী’, ‘পিসী’, ‘মামী’, ‘কাকী’ ইত্যাদি। হাত (শুঁড়) আছে যার সে ‘হাতী’, পাখা আছে যার সে ‘পাখী’। …‘হাতী’ জন্তুটা এত বিশালকায় যে তাকে আমি কোনদিনই ‘হাতি’র মধ্যে ধরাতে পারিনি – গ্রাফিক বিচারে, লিপির সঙ্গে

> চিত্রভাষার কানাকানিতে 'হাতি' আমার কাছে বরাবরই খারিজ। 'তাঁতি' বা 'চাষি'ও আমার কলম কোনদিন লিখতে পারেনি। তাঁত চালায় যে সে 'তাঁতী', চাষ করে যে সে 'চাষী'।... মূল নাম 'চিন' হলেও আমাদের নিজস্ব প্যারাডাইমে সুপ্রতিষ্ঠিত 'চীন'-এর অগ্রাধিকার স্বীকার্য। আর যদি বিশেষ্যপদে 'চীন' লিখি, তবে 'প্যাটার্ন রেকগনিশন'-এর খাতিরে বিশেষণপদে 'চীনা'ই লিখবো, 'চিনা' লিখবো না। 'চিনা' থাকবে কবির গানের 'যায় না চিনা'র জন্যে। চীনারা যখন ইংরেজী ভাষায় কথা বলেন বা লেখেন তখন তাঁদের দেশটিকে ন্যাকামো করে 'চিন' বলেন না, বা Chin লেখেন না, ইরেজীর রীতি মেনে 'চায়না'ই বলেন, China লেখেন।" (কেতকী কুশারী ডাইসন, 'বৈদগ্ধ্যের সপক্ষে'। মহাপাত্র ২০০৫: ৩৩৭)

তৃতীয় দলঃ সংস্কার হবে, তবে বিকল্প বানানও চালু থাকবে। দেবপ্রসাদ ঘোষ ও মনসুর মুসা বিকল্প বানান জারি রাখার পক্ষে। এঁদের যুক্তিঃ ভাষা ও ব্যাকরণে বিকল্পের ব্যবস্থা আছে – এক কথা অনেকভাবে বলা যায়; একই অর্থদ্যোতক শব্দ একাধিক ভাবে গঠন করা যায়। সুতরাং বানানেই বা বিকল্প থাকবে না কেন? মনসুর মুসা (২০০৭:১৩১-৩৩) হিসাব করে দেখিয়েছেন, বিকল্প বানান আছে এমন বাংলা শব্দের সংখ্যা ১৭৫ এর বেশি হবে না।

> "দুই চারিটি শব্দে দুই রকম বাণানের ব্যবহার থাকিলেও তাহাতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, যেমন ইংরাজীতে judgment, judgment; rhyme, rime; ইত্যাদি দুই প্রকার বাণানই প্রচলিত আছে – তাহাতে এমন কিছু আসে যায় না। সুতরাং তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কার প্রচেষ্টার বিশেষ কোন scope নাই, আবশ্যকতাও নাই।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেবপ্রসাদ ঘোষের পত্র। মজুমদার ১৯৯৭:১৬১)

চতুর্থ দলঃ সংস্কার হবে, তবে শুধু উপায় না থাকলেই বাধ্য হয়ে বিকল্প মেনে নিতে হবে।

> "বানানের সমস্যা কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে মিটবে না। সাধারণের অভ্যাস আর রুচি দেখতে হবে, বহু অসঙ্গতি মেনে নিতে হবে।... বিকল্প বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু যেখানে দুই বিরোধী দলের মত সমান প্রবল সেখানে আপাতত বিকল্প ভিন্ন উপায় নেই। ... সকল ভাষার বানানেই অল্পাধিক অসঙ্গতি দোষ আছে, বাংলা বানানেও আছে এবং থাকবে।" (রাজশেখর বসু, 'বাংলা বানানের নিয়ম')

পঞ্চম দলঃ সংস্কার হবে, তবে ইতিমধ্যে প্রচলিত বানানে হাত দেয়া যাবে না।

> "অনেক পণ্ডিত "ইতিমধ্যে" কথাটা চালিয়ে এসেছেন, "ইতোমধ্যে" কথাটার ওকালতি উপলক্ষ্যে আইনের বই ঘাঁটবার প্রয়োজন দেখিনে – অর্থাৎ এখন ঐ "ইতোমধ্যে"

> শব্দটার ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্ব বিচারের দিন আমাদের হাত থেকে চলে গেছে।" (দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র। মজুমদার ১৯৯৭:১৩৩)

ষষ্ঠ দল: সংস্কার হবে, তবে বাতিল বানানই ব্যবহৃত হবে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে। এই দলে আছেন রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাধিক উদ্ধৃতিতে এর প্রমাণ আছে।

সপ্তম দল: বানান যেমন আছে, চলুক। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, কেতকী কুশারী ডাইসন, মনসুর মুসা ও গোলাম মুরশিদ বানানে কোন প্রকার সংস্কারের পক্ষপাতী নন। মনসুর মুসা অবশ্য মনে করেন, বাংলা বানানে সংস্কারের সময় এখনও আসেনি।

> "ভাষা ও বানান কারও বিধান মেনে চলে না। তার মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান সংস্কার করার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হবে। অর্থাৎ বানানগুলো রাতারাতি শুদ্ধ হয়ে উঠবে না। বরং বানানের পানি আরও ঘোলা হবে।" (গোলাম মুরশিদ, 'দুখিনি বাংলা বানান'। দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা)

অষ্টম দল: এঁরা বাংলা বানানে সংস্কার চান তবে সেই সংস্কার হতে হবে যুক্তিসম্মত, কাণ্ডজ্ঞানসম্মত এবং ধীরগতিসম্পন্ন।

> 'বানানের যে সংশোধন অত্যাবশ্যক তা গ্রহণ করে ধীরে ধীরে চালাতে হবে। সব সংশোধন অত্যাবশ্যক নয়, অনেক সংশোধন আবশ্যকও নয়। এখনকার দিনে আমেরিকার ফেশন যা ইতিমধ্যেই ওদেশে পড়তির মুখে সেই ফেশনযুক্ত কোন কোন 'বিশেষজ্ঞ' ব্যক্তি বাংলা বানানকে ধ্বনিবিদ্যার সম্যক উপযোগী করে তুলতে চান। কিন্তু তা কোন দেশেই হয়নি আমাদের দেশেও হবে না। ... ভাষায় আমাদের যে অধিকার তা হল একদিকে উত্তরাধিকার এবং অপরদিকে দায়। তাই ভেবেচিন্তে সংস্কারের পথে অগ্রসর হতে হবে।" (সুকুমার সেন, 'ভাষাভাবনা'। মহাপাত্র ২০০৫: ৩৫৭-৫৮)

২৬. সরিষায় ভূত

> "ঈ-কার (এবং ঊ-কারের) প্রতি রবীন্দ্রনাথের অ্যালার্জি এবং তিরিশের দশকের বানান-কমিটি-কর্তৃক সেই অ্যালার্জিকে প্রশ্রয়দান (তদ্ভব শব্দে বিকল্পে 'ই', 'উ'র জন্য অনুমোদন) বাংলার স্বাভাবিক প্যারাডাইমটাকে এলোমেলে, রাহুগ্রস্ত, ভাঙাচোরা ক'রে দিয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হয়েছে, বিকল্পের ছিদ্রপথে বিশৃঙ্খলা এসেছে, বাংলা বানান শেখা সহজ না হয়ে বরং কঠিনতর হয়েছে।" (কেতকী কুশারী ডাইসন, 'বৈদগ্ধ্যের সপক্ষে'। মহাপাত্র ২০০৫: ৩২৪-২৫)

বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি এক পরিপত্রে সরকারি কাজে সর্বত্র বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান অনুসরণ করার জন্যে অনুরোধ করেছে। 'বাংলা একাডেমীর বানান' কথাটা নাহয় বোঝা গেল, কিন্তু 'বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান' মানে কি? এর মানে কি এই যে একমাত্র বাংলা একাডেমীর বানানই 'প্রমিত' (Standard) এবং অন্য সব বানান অ-প্রমিত, ব্রাত্য? অসঙ্গতির আকর হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ক্ষমতার সমর্থন থাকলেই কি কোন বিধি প্রমিত বলে বিবেচিত হতে পারে?

বাংলা একাডেমীর বানানরীতির প্রথম নিয়ম (১.০১): তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। এর পর ১.০৩ অনুসারে রেফ এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না: 'অর্চনা', 'অর্থ', 'কর্ম', 'কার্য'। বলা বাহুল্য,এই সবগুলো শব্দই তৎসম শব্দ। এর মানে হচ্ছে নিয়ম ১.০১ এবং নিয়ম ১.০৩ পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক। এর পর নিয়ম ২.০১ অনুসারে সকল অ-তৎসম, অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। এই নিয়ম অনুসারে 'বাংলা একাডেমী' বানানটিই ভুল। 'দেশী', 'বিদেশী' শব্দেও হ্রস্ব ই-কার ব্যবহৃত হওয়া উচিত, কারণ আমি যতদূর জানি, এ শব্দগুলো 'কর্ণ' বা 'স্বর্ণ' এর মতো তৎসম শব্দ নয়।

বাংলা একাডেমীর বানানরীতি অনুসারে বিদেশী শব্দে 'ট' বর্ণের পূর্বে স হবে। যেমন: 'স্টল', 'স্টাইল', 'স্টিমার', 'স্টুডিও', 'স্টেশন', 'স্টোর','স্ট্রিট'। কিন্তু 'খ্রিষ্ট' যেহেতু বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম 'কৃষ্টি','তুষ্ট', ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই ষ্ট দিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে। 'খ্রিষ্ট' যদি আত্তীকৃত শব্দ হয়, তবে 'স্টিমার', 'স্টেশন' কোন যুক্তিতে আত্তীকৃত শব্দ হবে না? যদি প্রমিত বাংলাভাষায় 'খ্রীষ্ট', 'ষ্টিমার' ও 'ষ্টেশন' শব্দ একই শিষধ্বনি দিয়ে উচ্চারিত হতে পারে তবে এই শব্দগুলোর বানানে কেন একই শিষবর্ণ ব্যবহার করা যাবে না?

> "ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ বাঙ্গালা বানানে বজায় রাখিবার জন্যে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বাংলায় স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। (যদিও ভুল করিয়া বহু স্থলে 'ষ্ট'-এর বদলে 'স্ট' লিখিয়া থাকি – লিখিয়া থাকি – খাঁটি বাঙ্গালীত্ব পাইয়া বসিয়াছে এমন বিদেশী শব্দেও – যেমন 'মাস্টার, 'খৃস্ট, ইস্টিশন'–শুদ্ধ বাংলা রূপ 'মাষ্টার, খ্রীষ্ট, ইষ্টিশন' স্থলে।" (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা অক্ষরে ইংরেজী নাম ও শব্দ'। মজুমদার ১৯৯৭: ২১৭)

উভয় বঙ্গে অন্য যে কয়েকটি বানানবিধি প্রস্তাবিত হয়েছে সেগুলোতেও এ জাতীয় স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতি রয়েছে (দেখুন মহাপাত্র ২০05 এর বিভিন্ন প্রবন্ধ)।

> "এঁরা যে সব বানান সংস্কারের কথা বলেছিলেন তা মোটামুটি ভালো, কিন্তু তা এতই অস্পষ্ট (Vague) যে তা কার্যকর করা যায়নি। তাঁরা কিছু – আমার তখনকার এবং

> এখনকার মতে – অন্যায়ও করেছিলেন। এবং বহু লোকে ভুল করে বলে ‘কুটির’-এর মতো অর্বাচীন ও অশুদ্ধ বানান গ্রহণ করা। ২. সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে বিশুদ্ধ শব্দকে ভুল মনে করে তা সংশোধন করা। এর উদাহরণ হল ওঁদের গৃহীত বানান – যা অনেকে লেখে – ‘পাশ্চাত্ত্য’ (‘পাশ্চাত্য’ স্থানে) গ্রহণ করা। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বড় বড় লেখক যেখানে ‘পাশ্চাত্য’ বানান লিখে গেছেন তখন বানানটিতে ভুল আবিষ্কার করে শুদ্ধ করতে যাওয়ার – বানানের ভার বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা ছিল? আসলে কিন্তু ‘পাশ্চাত্য’ বানানই ঠিক, ‘পাশ্চাত্ত্য’ ভুল। বৈদিক ‘পশ্চা’ শব্দে -‘ত্য’ প্রত্যয় করে হয়েছে, ‘পশ্চাৎ’ শব্দে নয়। যেমন, ‘দাক্ষিণাত্য’ (দক্ষিণা+ত্য)” (সুকুমার সেন, ‘ভাষাভাবনা’। মহাপাত্র ২০০৫: ৩৫৬)

মনসুর মুসা (২০০৭:৪৯-৫২) দেখিয়েছেন, বাংলা একাডেমীর বানানের বেশ কিছু নিয়ম বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যবহৃত বাংলা শব্দের বানানের নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিক। সংবিধানের বানান: ‘আপীল’, ‘বাঙালী’, ‘রপ্তানী’, ‘রীট’, ‘নির্বাহী’ ইত্যাদি বাংলা একাডেমীর বানানের নিয়মমতে ভুল বানান। শুদ্ধ বানান হবে: ‘আপিল’, ‘বাঙালি’, ‘রপ্তানি’, ‘রিট’, ‘নির্বাহি’। মনসুর মুসা (২০০৭:৫১) বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ ধারার (২) উপধারা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন: “জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।” সুতরাং যতক্ষণ না সংবিধানে বাংলা শব্দের বানান সংশোধিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর বানানের অনেকগুলো নিয়মই বাতিল বলে গণ্য হওয়া উচিত। কোন বাতিল বানান, সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বানান অনুসরণ করতে বলা সংবিধান অবমাননা হিসেবে গণ্য হতে পারে কি না সে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

২.চ. বানান-সংস্কারে পূর্ব-পশ্চিম

বানান-সংস্কারের যত রকম যৌক্তিক ও অযৌক্তিক প্রস্তাব এসেছে তার বেশির ভাগই এসেছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। বানান সংস্কারের তেমন কোন প্রস্তাব পূর্ববঙ্গ থেকে আসেনি, ৭১ সালের আগেও না, পরেতো নয়ই। বানানের ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত সংস্কার করার মতো শিক্ষা, জ্ঞান ও ক্ষমতা পূর্ববঙ্গের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কখনও আদৌ ছিল কিনা নির্দ্ধিধায় সে প্রশ্নের হ্যাঁ-বোধক উত্তর দেয়া কঠিন। আমি মনে করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কারকেই বাংলাদেশে কমবেশি চোখ বুজে অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলা একাডেমীর বানানবিধি অনেকাংশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির কার্বনকপি। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি কমবেশি গৃহীত হয়েছিল, কারণ ত্রিশের দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ‘সবেধন বিশ্ববিদ্যালয় মণি’। আজ সর্ব বঙ্গে বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের ভিড়ে নতুন কোন বানানবিধির প্রচলন দূরে থাক, প্রস্তাব করাও সহজ হবে না।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রমিত বাংলার উচ্চারণে কিছুটা হলেও পার্থক্য আছে। বানানে উচ্চারণের প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যেই যদি বানান সংস্কার করা হয়ে থাকে, তবে বাংলা শব্দের বানান কোন বঙ্গের উচ্চারণকে অনুসরণ করবে, বাংলাদেশের উচ্চারণকে, নাকি পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণকে? যদিও স্বাধীন ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র গঠন করার কারণে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা অন্য বঙ্গের বাঙালিদের তুলনায় রাজনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে আছে, তবুও ঐতিহাসিকভাবে এবং সাংস্কৃতিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকার একটি (বদ)অভ্যাস অন্য সব বঙ্গের মতো বাংলাদেশেরও আছে। বাংলাদেশের অনেক বুদ্ধিজীবীই বাংলায় 'কি লিখবেন, কেন লিখবেন' জানতে আনন্দবাজারের দ্বারস্থ হন। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের লেখা বাংলাদেশের পাঠক যতটা পড়েন, পশ্চিমবঙ্গের পাঠক বাংলাদেশের লেখকের লেখা ততটা পড়েন না, কোনকালেই পড়তেন না, কখনও সহজলভ্য না হওয়ার অজুহাতে, কখনওবা বোধগম্য না হওয়ার অজুহাতে।

ইদানিং ইন্টারনেটে দৈনিক পত্রিকা সহজলভ্য হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক পত্রিকাও পড়ছেন বাংলাদেশের পাঠকেরা। এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে বাংলাদেশের লেখক ও সাংবাদিকদের ভাষা-ব্যাবহারে। বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকায় 'আবার' না লিখে ইদানিং 'ফের' লেখা হচ্ছে, ১লা বৈশাখ না লিখে লেখা হচ্ছে ১ বৈশাখ। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীরা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে হিন্দি ভাষার ব্যাকরণ দ্বারা প্রভাবিত হন, আবার পশ্চিম বঙ্গের ভাষা-ব্যাবহার প্রভাবিত করে বাংলাদেশের বাংলাভাষাকে। এর উল্টোটা কখনও দেখা যায়নি, ভবিষ্যতেও দেখা যাবে বলে মনে হয় না। বানানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যেতে পারে। হিন্দির প্রভাব অস্বীকার করার ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গের নেই, আবার পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমের প্রভাব অস্বীকার করার ক্ষমতা অন্য কোন বঙ্গের নেই। পায়ের নিচে পড়ে থাকা কৃত্রিম রাজনৈতিক সীমান্তকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভাষা ও সংস্কৃতির উপর (অপ)প্রভাব আসছে মাথার উপর দিয়ে, আকাশপথে, 'টেলিভিশন' নামক পুস্পকরথে। সব মিলিয়ে, হিন্দি ও পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে বদলে যাচ্ছে সর্ব বঙ্গের সর্ব অঙ্গ – ভাষা, ব্যাকরণ, বানান ও সংস্কৃতি। না, কোন দুঃখ নেই, কারণ আমি জানি, সন্তান যদি অপদার্থ হয় তার 'মাতৃ'-ভাষার এটাই নিয়তি।

উপসংহার

> "সরলতা ও বিশুদ্ধি অপেক্ষা একরূপত্ব (uniformity) ভাষায় বেশী আবশ্যক। ভাষার রূপকে সুস্থির (stabilize) করিবার মূল মন্ত্রই এই যে সুপ্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ বা বাণানকে মানিয়া লইতে হইবে; যদি ব্যাকরণদুষ্টও হয় তবে ইহাকে নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ... ভাষার রূপ সম্বন্ধে বহুল-প্রয়োগ (usage) এবং প্রাচীনতাই (antiquity) সেরা প্রমাণ।" (দেবপ্রসাদ ঘোষ এর ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত

> ‘বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান’ গ্রন্থ থেকে দেয়া এই উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে কেতকী কুশারী ডাইসনের ‘বৈদদ্ধ্যের সপক্ষে’ প্রবন্ধ থেকে। মহাপাত্র ২০০৫: ৩০৮)

পৃথিবীতে বর্তমানে প্রচলিত হাজার ছয়েক ভাষার মধ্যে মাত্র শ খানেক ভাষার লিপি আছে। বলা বাহুল্য, এসব লিপিহীন ভাষাগুলোর প্রত্যেকটির শব্দকোষ আছে, শব্দ ও বাক্য গঠনের নিয়ম আছে, আছে শব্দ ও বাক্য উচ্চারণের নিয়ম। যেহেতু লিপি ছাড়া কোন ভাষা ও ব্যাকরণের বেশ চলে যায়, সেহেতু লিপি বা শব্দের বানান কোন মতেই ভাষা বা ব্যাকরণের অপরিহার্য্য অংশ হতে পারে না। আবার যেসব ভাষার লিখিত রূপ আছে সেগুলোর কোনটিতেই বহুলিপিতা অর্থাৎ একই শব্দের একাধিক বানান থাকা বিরল কোন ব্যাপার নয়। কোন ভাষায় বহুলিপিতা আদৌ সহ্য করা হবে কি না, বা করা হলে কতটা সহ্য করা হবে সে ব্যাপারে ব্যাকরণের তেমন কিছু বলার নেই, কারণ বহুলিপিতার কারণে ভাষিক চিহ্নের প্রধান বৈশিষ্ট্য বৈপরীত্যের কোন হানি হয় না। সুতরাং ‘করিবেন্না/করিবেন না’, ‘বিজ্ঞান/বিগগান’, ‘শফিক রেহমান/শফিক্রেহমান’, ‘প্রথমালো/প্রথম আলো’, ‘আনন্দবাজার/আনন্‌দবাযার’,‘বৈশাখ/ বইশাখ/ বইষাখ/বইসাখ’ ইত্যাদি একাধিক ধরণের বানানের মধ্যে যেটিই চালু হোক না কেন ব্যাকরণের তাতে কিছু যাবে আসবে না। একই ভাবে ‘শামী কাবাব’ শব্দটিকে যদি ‘স্বামীকাবাব’ লেখা হয় তাতে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের কোন নিয়মকে অস্বীকার করা হয় না। যেহেতু বানান নিয়ে যত আলোচনা হয় তার বেশির ভাগই ব্যাকরণের আওতায় পড়ে না সেহেতু বানানচর্চাকে ভাষাবিজ্ঞানচর্চা মনে করলে ভুল হবে।

তবে অন্য অনেক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীর মতো ভাষাবিজ্ঞানী এটুকু বলতেই পারেন যে বানান ছিনিমিনি খেলার বস্তু নয়। বানান যেহেতু মানুষের ঐতিহ্যের অংশ, যেহেতু বানানের সাথে শব্দের প্যাটার্ন বা ছক চেনার একটা ব্যাপার জড়িয়ে আছে, এবং সর্বোপরি, বানানের সঙ্গে যেহেতু ব্যক্তি ও জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে থাকে (উদাহরণ:পরীক্ষায় পাস/ফেল), সেহেতু বানানের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত অবশ্যই যুক্তিসম্মত এবং যথাসম্ভব সর্বসম্মতভাবে নেয়া উচিত। জীবনের ধর্ম বৈচিত্র্য, কিন্তু যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, যে কোন মূল্যে ঐক্য বা Uniformity স্থাপন, সে বানানের ক্ষেত্রেই হোক বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হোক। কিন্তু সরকারকে এটাও মনে রাখতে হবে যে সবাই এক বানান ব্যবহার করা শুরু করলেও চিরদিন সেই বানান বহাল থাকবে না। সবচেয়ে সুস্থির বানানরীতিতেও বৈচিত্র্য ঢুকে পড়বে, পড়বেই। আজকের বানান আগামিকালের মানুষ বিনা প্রশ্নে মেনে নেবে না। তাদের যুগের উচ্চারণরীতি অনুসারে, ব্যুৎপত্তির দাবি মেনে তারাও বানান সংস্কারের উদ্যোগ নেবে।

বানান অবশ্যই কালের প্রবাহে বদলাবে, কিন্তু কমিটি করে, কিছু সংখ্যক লোকের বা কোন এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর খেয়ালখুশি মতো বানান সংস্কার করে ভাষাপ্রপঞ্চে অকারণ

অস্থিরতা সৃষ্টি করাটা আখেরে লাভজনক হবে কিনা সমাজ ও রাষ্ট্রকে তা ভেবে দেখতে হবে। পবিত্র সরকার (প্রথম আলো) ঠিকই বলেছেন, "আমরা চাই আর না-ই চাই – বাংলা বানানের সংস্কার এবং সমতা-বিধান গত শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে – তার ফলাফলকে বিসর্জন দিয়ে আমরা হ্যালেডের আগে পুঁথির যুগে ফিরে যেতে পারি না।" না, অবশ্যই পারি না। কিন্তু এটাওতো ঠিক যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্যোগে কোন সংস্কার না হলেও বাংলা বানানে পরিবর্তন আসতো। সে পরিবর্তন হতো ধীর গতির স্বাভাবিক পরিবর্তন, 'সহর/শহর' এর মতো।

সংস্কারে আমার আপত্তি নেই, আপত্তি আছে বিকল্প বানান রহিত করাতে। এছাড়া, আগেই বলেছি, সংস্কার করলেইতো শুধু হবে না, সংস্কার যুক্তিসম্মত এবং কাণ্ডজ্ঞানসম্মত হতে হবে। তড়িঘড়ি করে নেয়া যে কোন সরকারী সিদ্ধান্তে যেমন অসঙ্গতি থাকে, এ পর্যন্ত যত বানানরীতির প্রস্তাব করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে অসঙ্গতি আছে, যা দেখে সন্দেহ হয়, যাঁরা জনগণের উপর সংস্কার চাপিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান উভয়েরই খামতি নেইতো! বানান সংস্কারকদের একজন, রাজশেখর বসু নাকি জানতেনই না যে একাধিক প্রাকৃতের অস্তিত্ব ছিল! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও যে প্রাকৃত, অপভ্রংশ ইত্যাদি ভাষারূপ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল না রবীন্দ্রনাথকে লেখা একাধিক চিঠিতে দেবপ্রসাদ ঘোষ তার স-উদাহরণ প্রমাণ দিয়েছেন। যোগেশচন্দ্র রায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ নমস্য ব্যক্তিদের বানান-রীতি তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

মূর্ধন্য 'ণ' বর্ণটি যদি রাখা হয় তবে তাকে যেন 'উজিরে খামাখা' বা দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করে রাখা না হয়। মূর্ধন্য ণ-কে বানানেও ব্যবহার করতে হবে। ন্যূনতম ব্যবহার আছে এমন কোন বর্ণই বাদ দেয়া ঠিক হবে না, সম্ভব হলে অন্তস্থ 'ব' এর জন্যে নতুন একটি বর্ণ আমদানি করা উচিত (অসমিয়ার পেট কাটা 'ব' এর কথা ভাবা যেতে পারে)। মনসুর মুসা (২০০৭) ঠিকই বলেছেন, যুক্তাক্ষর ভাঙার ('রবিনদ্রনাথ', 'শহীদুল্লা') পণ্ডশ্রম করে লাভ নেই। যদি যুক্তাক্ষর সরলীকরণ করতেই হয়, তবে যে যুক্তাক্ষরগুলোকে জটিল বলে মনে হয় সেগুলো যেন একেবারে বাদ দিয়ে দেয়া না হয়। দুই ধরণের যুক্তাক্ষরই থাকুক। জাপানের স্কুলে যে সব বাঙালি শিশুরা পড়ে তাদের কখনও দেখিনি হাজার তিনেক চিত্রলিপি আর দুই দুইটি বর্ণমালা (হিরাগানা ও কাতাকানা) শেখা নিয়ে কোন অভিযোগ করতে। বাংলা যুক্তাক্ষর কি চিত্রলিপির চেয়েও অস্বচ্ছ, অসহ্য, সংখ্যাধিক্যে জর্জরিত? ক্যাপিট্যাল, স্মল, টানা হাতের মিলে ইংরেজি বর্ণমালার (২৬ দু'গুনে ৫২ দু'গুনে) ১০৪টি বর্ণ কি সারা পৃথিবীর শিশুরা শেখে না?

যুক্তাক্ষর আয়ত্ত করতে কোন বাঙালি শিশুর কোন সমস্যা কখনও হয়েছে বলে শোনা যায়নি। তাছাড়া, পুরোনো যুক্তাক্ষর যদি আজকের শিশুরা না শিখে তবে বিশাল বাংলা

সাহিত্য যার সিংহভাগই লেখা হয়েছে যুক্তাক্ষর দিয়ে তার সাথেইবা কিভাবে তাদের পরিচয় ঘটবে? আর, সংস্কারকেরা না হয় বাংলা বানানকে ‘জলবৎ তরলং’ সহজ করে দিলেন, কিন্তু শব্দকোষ আর ব্যাকরণের হাজার জটিলতা থেকে তাঁরা কি ভাষাকে মুক্ত করতে পারবেন? আমি বলি: শিক্ষার ‘পদ্ধতি’ সহজ করুন, শিক্ষার ‘বস্তু’ সহজ করার প্রয়োজন নেই। শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ থাকতে হবে, তা না হলে শিক্ষার আনন্দটাই মাটি। শিশুদের মেধাহীন, বোকা ভাবার কোন কারণ নেই।

রাজা কান দিয়ে দেখেন। প্রতিবাদীদের আলোচনা-সমালোচনা শুনে প্রতিষ্ঠানকে, সরকারকে পরিস্থিতি বুঝতে হবে। যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদকে বালখিল্য ‘খুনসুটি’ মনে করলে আখেরে সরকারের Cost বাড়বে, জনগণের বাড়বে কষ্ট। এক তরফাভাবে চাপিয়ে দেয়া বানান কোন দেশেই জনপ্রিয় হয়নি, বাংলাদেশেও হবে না। সুতরাং বিকল্প রাখতেই হবে, আলোচনা সমালোচনার পথও খোলা রাখতে হবে। নচেৎ পর্বত মূষিক প্রসব করবে, মূষিক পর্বত প্রসবের ধৃষ্টতা দেখাবে, অথাৎ সব মিলিয়ে জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ ও সময়ের অপচয় হবে, কাজের কাজ কিছু হবে না।

পৃথিবীর যে সব দেশে বানান সংস্কার হয়েছে সেসব দেশের সরকার বাহাদুর সংস্কারের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন। সুতরাং বানান সংস্কার রাজনীতির অংশ, এবং বাংলাদেশের ডিগবাজী-বিশারদ কোন কোন নেতা যেমন বলেন: ‘রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই’, তেমনি সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা নতুন, হাল আমলের বানান ছেড়ে আবার পুরোনো, সাবেক বানানে ফিরে যাচ্ছেন, এমনটি ঘটাও অসম্ভব কিছু নয়। পৃথিবীর একাধিক দেশে এমন ঘটনা অতীতে ঘটেছে, ভবিষ্যতেও যে ঘটবে না এমন কথা হলফ করে বলা যায় না।

সহায়ক গ্রন্থ

ঘোষ মণীন্দ্রকুমার (১৪০০) *বাংলা বানান*। দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা।

চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার (১৯৪৫) *ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। (আধুনিক সংস্করণঃ রূপা, কলিকাতা)।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ (১৩৯১) বাংলা শব্দতত্ত্ব। বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

Ford, Alan, Rajendra Singh and Gita Martohardjono (1997) *Pace Panini, towards a Word-based theory of Morphology.* Peter Lang, New York.

ভট্টাচার্য্য শিশির (১৯৯৮) *সঞ্জননী ব্যাকরণ*। চারু প্রকাশনী, ঢাকা।

ভট্টাচার্য মিতালী (২০১০) *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন*। পারুল প্রকাশনী, কলিকাতা।

মজুমদার নেপাল (১৯৯৭) *বানান বিতর্ক*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আমাদেমি, কলিকাতা।

মজুমদার পরেশচন্দ্র (১৯৮২) *বাংলা বানানবিধি*। দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা।

মহাপাত্র তুষারকান্তি (২০০৫) ভাবনা: বাংলা ভাষা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক। অবভাষ, কলিকাতা।

মুসা মনসুর (২০০৭) *বানান: বাংলা বর্ণমালা পরিচয় ও প্রতিবর্ণীকরণ*। এডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

মুরশিদ গোলাম (২০১২) দুখিনি বাংলা বানান। *দৈনিক প্রথম আলো* (৫ই অক্টোবর, ২০১২) ঢাকা।

সরকার পবিত্র (১৯৮৭) *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা*। চিরায়ত প্রকাশন, কলিকাতা।

সরকার পবিত্র (২০১২) বাংলা বানান তোমার কিসের দুঃখ। *দৈনিক প্রথম আলো* (১২ই অক্টোবর, ২০১২) ঢাকা।

সেন সুকুমার (১৩৯৩) *শরৎসাহিত্যসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

হক মাহবুবুল (২০০৮) *বাংলা বানানের নিয়ম*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

(সম্পাদক বিহীন) (১৯৮৬) *প্রসঙ্গ বাংলাভাষা*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কলিকাতা।